জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মুখপত্র

বুলেটিন নং ৩১ ☐ ১২ বর্ষ ☐ মার্চ ২০০৩ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

ফেলে আসা সংগ্রাম হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি - জীবন চাকমা

প্রতিক্রিয়া
পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক কথা

বিশেষ প্রতিবেদন
দীঘিনালায় ইউপি নির্বাচনে জুম্মদের উপর সেটেলারদের হামলা

বিশেষ প্রতিবেদন
ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে শালবন গুচ্ছগ্রামে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থানান্তরিত

বিশেষ প্রতিবেদন
পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে সেটেলার উন্নয়ন বোর্ডে রূপান্তর!

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন
সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত জমি বৈধ করার প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র চলছে অব্যাহতভাবে

অভিমত
রাঙ্গামাটিস্থ পার্বত্য বাণিজ্য মেলা ২০০৩ ঃ কিছু প্রশ্ন

বিশেষ প্রতিবেদন
সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হলো লংগদু'র দু'টি জুম্ম গ্রাম ॥ ৬৫ পরিবার উদ্বাস্তু

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা- তনয় দেওয়ান

সংবাদ প্রবাহ
সংগঠন সংবাদ

আন্তর্জাতিক
পিসিজি'র সাধারণ সম্পাদকের শ্রীলংকা সফর

সম্পাদকীয়

অতি সম্প্রতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সমন্বয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৩১ জানুয়ারী, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১২ মার্চ ২০০৩ চার দফা বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত বৈঠকে আইন, সংসদ ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ, ভূমি মন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপমন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ান, বিএনপি হুইপ ওয়াহিদুল আলমসহ সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আরোহণের পর বলা যায় বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এটাই প্রথম ধারাবাহিক উদ্যোগ। তাই স্বাভাবিকভাবে এই উদ্যোগের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত পাহাড়ী-বাঙ্গালী স্থায়ী অধিবাসীগণ আশান্বিত না হয়ে পারে না।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে আছে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি, স্বদেশ প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণভাবে উদ্বাস্তু জুম্মদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা কমিটি বস্তুতঃ অকার্যকর হয়ে আছে। চুক্তি বাস্তবায়নের স্বার্থে এসকল কমিটিগুলোর পুনর্গঠন তথা কার্যকর করা অতীব জরুরী ও অপরিহার্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম জটিলতম দিক ভূমি সমস্যা সমাধানার্থে চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধন পূর্বক ভূমি কমিশনের কার্যক্রম শুরু করাও অত্যন্ত জরুরী। সবচেয়ে আশার কথা যে, এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার উদ্যোগে আহুত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক সভায় এসকল মৌলিক বিষয়সমূহ নিয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগজনক যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রক্রিয়া শুরু করার ক্ষেত্রে যখন এরূপ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেসময় গত ১১ মার্চ ২০০৩ রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর সমাপনী বক্তৃতা প্রদানকালে সংসদে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে যে কথা বলেছেন তা পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙ্গালী সকল স্থায়ী বাসিন্দাদের আশাহত করেছে। তিনি উক্ত বক্তৃতায় যা বলেছেন তার সারমর্ম হলো - বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে স্বাক্ষরিত চুক্তির মধ্যে সংবিধান বিরোধী অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই চুক্তির বাস্তবায়ন কি হবে তা বর্তমান সরকার জানে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর এহেন অদূরদর্শী বক্তব্য শান্তিকামী জুম্ম জনগণসহ পার্বত্যাঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মনে হতাশা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অবাস্তবায়িত থাকলে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা আবার জটিলতর হয়ে উঠবে তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে সুদূর পরাহত। অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে অর্জিত সম্ভবনার দ্বার ভূলুণ্ঠিত হবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সরকার সহ সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল মহলের অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে নেতিবাচক নয়, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসলে সার্বিকভাবে সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গল হবে।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হলো। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তো বটেই, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রেক্ষাপটেও এ দিবসের তাৎপর্য অপরিসীম। বিগত সংঘাতময় পরিস্থিতি কালে জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার-নিপীড়নের ক্ষেত্রে সেনাবাহিনী এবং দাঙ্গা ও ভূমি বেদখলকারী সেটেলারদের অন্যতম কৌশল ছিল জুম্ম নারী ধর্ষণ, অপহরণ, খুন ও যৌন হয়রানি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণে চুক্তি-উত্তর কালেও জুম্ম নারীদের উপর নানা কায়দায় সেই একই ধারায় মানবাধিকার বিরোধী সহিংস তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। এহেন অবস্থায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনসহ সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ কর' স্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে এ বছর তিন পার্বত্য জেলায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হলো। নারী নির্যাতনসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করার ক্ষেত্রে আশু করণীয় হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়ন করা। তাই সকল প্রকার দ্বিধাসংশয় ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে এটাই ছিল জুম্ম নারী সমাজের এ বছরের প্রত্যাশা।

ফেলে আসা সংগ্রাম হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি

জীবন চাকমা

এক.

পার্বত্য চট্টগ্রামের ১১টি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম শুরু হয় তার প্রথম থেকে যুক্ত হয় ভ্রাতৃঘাতী সহিংসতা; একই সাথে বিভিন্ন সময়ে চলতে থাকে সমঝোতাও। সশস্ত্র সংগ্রাম আর সহিংসতার এক পর্যায়ে ১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বর নির্মমভাবে শহীদ হন এম এন লারমা ও তাঁর আটজন সহযোদ্ধা। এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় নিজেদের মধ্যে। ভিন্নমতাবলম্বী অথচ স্বজাতির লোকেরাই এই পৈশাচিক আক্রমণ চালায়। এই মৃত্যুতে আমরা কেউ খুশী হতে পারিনি। মর্মাহত হয়েছে আপামর মানুষ। যারা হত্যাকান্ড চালিয়েছে তারাও কতটুকু উল্লসিত হতে পেরেছে তাতে আমার সন্দেহ আছে। তবে অনেকে জানে যে হত্যাকারীরা হত্যা পরিকল্পনার সাফল্যে খাসী মুরগী যা হাতে পেয়েছে তা দিয়ে আনন্দ উল্লাস করেছে। যদিও নিঃসন্দেহে আনন্দ উল্লাসটা ছিল নিতান্তই সাময়িক। রক্তক্ষয়ী ঐ হত্যাকান্ডের ফলে কোন পক্ষ কি লাভবান হতে পেরেছে? আদতে আমাদের কেউ লাভবান হয়নি। লাভবান করা হয়েছে শত্রু পক্ষকে। সামগ্রিকভাবে জুম্ম জাতির অপুরণীয় ক্ষতি হয়েছে একথা সবার স্বীকার করতে হবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আভ্যন্তরীণ কোন্দল আর সমঝোতাই ছিল ১০ নভেম্বর হত্যাকান্ডের ফলশ্রুতি? ১৪ জুন ১৯৮৩ সালে আভ্যন্তরীণ সংঘাত সমঝোতার মাধ্যমে সমাধানের ঘটনা আজো অনেক পার্টি কর্মী স্মরণ করে। গোলকপতিমা চেংগী উপত্যকার একটি নিভৃত অরণ্যাঞ্চলে দ্রুত নিষ্পত্তিপন্থীদের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষ হয়। সমূহ পরাজয় দেখে দ্রুত নিষ্পত্তিপন্থীরা সমঝোতার প্রস্তাব দেয়। সমঝোতার প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করা হয়। উক্ত অনাক্রমণ চুক্তি বা 'ক্ষমা করা ভূলে যাওয়া' নামের সমঝোতার কত বড় বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে তার করুণ পরিণতি দেখা যায় ১০ নভেম্বরের বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ। ফলে সমঝোতা, আন্তরিকতা, উদারতা ইত্যাদি শব্দের অর্থ অনেকের কাছে আজ পানসে হয়ে গেছে। সমঝোতা মানেই এখন সংশয়। সেই বিভেদপন্থীরা ১৯৮৫ সালের ২৯ এপ্রিল রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি টানে সংগ্রামের। সেদিনও আমাদের ভাইবোনেরা ফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে ওদের স্বাগত জানায়। ঠাট্টা মচকারীও হয়েছে, হয়েছে অনেক বিদ্রুপ। তবুও সেদিন পাঁচ দফা ওদের কাছে টেনে নিয়েছে। না নেবেই বা কেন? ওরাও আমাদের ভাই, আমাদের সমাজের সন্তান। ওদের হত্যা করে কি সেদিন পাঁচদফা অর্জন করা যেত? মোটেই না। অথচ ওদের দ্বারাও আন্দোলনের ক্ষতি কম হয়নি! কিন্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি হত্যার রাজনীতি থেকে দূরে ছিল বলেই সংঘাত থেমে গেছে।

আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের যে সংগ্রাম তাতে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে জনসংহতি সমিতি আর এতে অংশ নিয়েছে কমবেশী সবাই। এদের মধ্যে দালালীপনা যেমন করেছে অনেকে আবার চরম বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে। সংগ্রামে আত্মত্যাগ আর আত্মঘাত দুটোই হয়েছে। এই আত্মত্যাগ পার্টির কর্মীরা যেমন করেছে তেমনি পার্টির কর্মী নয় এমন সাধারণ মানুষও করেছে। অপরদিকে সবচেয়ে বেশী আত্মঘাতী ভূমিকা নিয়েছে পার্টি কর্মীরাই। আন্দোলনকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে পার্টিকর্মী, পার্টির সাথে সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষ। পার্টির সাথে বেঈমানীও করেছে পার্টি কর্মীরা, পার্টি কর্মীর ভাই বন্ধু বা ছেলেমেয়ে, পার্টির পৃষ্ঠপোষকতায় জীবিকা নির্বাহ করেছে এমন সাধারণ মানুষ। পার্টির বাইরে যারা আর্মীদের সাথে সম্পর্ক করে বা সরকারের সাথে নানাভাবে সহযোগিতা করে জেনে না জেনে আত্মস্বার্থের জন্য সামগ্রিকভাবে ক্ষতি করেছে তাদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। সামগ্রিক অর্থে আত্মমুখী সংঘাতের ফলে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে সংগ্রাম তা বার বার সমঝোতার পথে ঠেলে দিয়েছে। আর সমঝোতা মানেই হলো সমর্পণ। ক্ষুদ্র শক্তির সাথে বৃহৎ শক্তির সমঝোতার অর্থই হলো ক্ষুদ্র শক্তির সর্মপণ। আমাদের বেলায়ও তার জন্য নিজেরাই দায়ী। এক অর্থে এই ব্যর্থতাই আমাদের আন্দোলনকে এগোতে দেয়নি।

সমঝোতার কথা আজ কে না বলছে। ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবি সাধারণ মানুষ সবাই চায় ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত নির্মূল করতে সমঝোতা হোক। জনসংহতি সমিতির কর্মীরাও সমঝোতার কথা বলছে না তা নয়। জনসংহতি সমিতি নেতৃত্বও চায় সংঘাতহীন আবহাওয়া। আন্দোলন সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে চলতেই হবে। এই সমঝোতাও বিবিধ রকমের হতে পারে বিবিধ পরিস্থিতিতে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম্ম জনগণের অধিকারের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনের মাধমে সংগ্রাম গড়ে তোলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। জনসংহতি সমিতির এই আন্দোলনকে ঘিরে পরবর্তীতে গড়ে উঠে নানা মতের নানা নেতৃত্বের সংগঠন। দেশে এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংগঠন গঠিত হয়। তার কোনটা পুরোপুরি রাজনৈতিক চরিত্রের, আবার কোনটা সাংস্কৃতিক বা মানবাধিকারের জন্য। যা কিছুই হোক যে নামেই হোক সবার উদ্দেশ্য কিন্তু জুম্মদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা রাজনৈতিক অধিকারের জন্য, বাংলাদেশ সরকারের নিপীড়ন থেকে জুম্মদের মুক্ত করার জন্য, বাংলাদেশ সরকারের নিপীড়নের

বিরুদ্ধে প্রচারের জন্য, জুম্ম জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা দেশে বিদেশে প্রকাশ করার জন্য। এদের মধ্যে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠা সংগঠনও আছে যেগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নানা কাজে জড়িত হয়। ট্রাইবেল কনভেনশন, ত্রিপুরা উন্নয়ন সংস্থা, মারমা উন্নয়ন সংসদ, পরবর্তীতে চাকমা উন্নয়ন সংসদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জন কল্যাণ সমিতি, গণপ্রতিরোধ কমিটি, নয় দফা রূপরেখা বাস্তবায়ন কমিটি, শান্তি কমিটি, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, পাহাড়ী গণ পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, জুম্ম পিপলস নেটওয়ার্ক ইন ইউরোপ, জুম্ম পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। এদের কোনটা জনসংহতি সমিতির সমর্থনে বা জনসংহতি সমিতির পরামর্শে, কোনটা আর্মীদের দ্বারা সরাসরি জনসংহতি সমিতি বিরোধীতার জন্য, আবার কোনটা সরকারের রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের জন্য আবার কোনটা স্বাধীনসত্ত্বা নিয়ে গড়ে তোলা হয়।

জনসংহতি সমিতি চায় জুম্মদের সকল শক্তিকে সংঘবদ্ধ করতে। বিভিন্ন উদ্যোগ একত্রিত করতে। অথবা তার কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সকল উদ্যোগের সমন্বয় সাধন করতে। কেননা আমরা দুর্বল আর শত্রু আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিশালী। সুতরাং নিজেদের মধ্যেকার সকল শক্তির একই জায়গায় সমাবেশ করা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু না তা হয়নি। বরং উল্টোটাই হয়েছে বেশী। কেবল বিভক্ত হইনি, হয়েছি বিক্ষতও। অর্থাৎ অধিকাংশ জুম্ম জনগণ মানতে পারলেও অনেকেই মূল শক্তি জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে মানতে পারিনি। কেবল মানতে না পারাই শেষ কথা নয়। আমরা চূড়ান্তভাবে ক্ষতি করেছি বা ক্ষতি করার চেষ্টা করেছি আন্দোলনের মূল শক্তিকে। অথচ মূল শক্তিকে আরো শক্তিশালী করা উচিৎ ছিল। নানা কারণে নানা পরিস্থিতিতে আমাদের সমাজের কিছু লোক জুম্ম জাতিকে ভালবাসলেও, জুম্ম জাতির জন্য ভালো কিছু করার মানসিকতা লালন করলেও এমনকি জনসংহতি সমিতির আন্দোলনকে স্বীকার করলেও জনসংহতি সমিতি নেতৃত্বকে মানতে পারেনি। পার্টির পরামর্শে, পার্টিকে আমব্রেলা (মূল) সংগঠন মেনে নিয়ে জুম্ম জনগণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে পারিনি আমরা। এ জন্য কি কেবল জনসংহতি সমিতি দায়ী? আপনারা নিজেরাও কি মোটেই দায়ী নন?

কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে নাকি একনায়কতন্ত্রের আর গণতন্ত্রের। জনসংহতি সমিতি নাকি চায় একনায়কতন্ত্র। আর অন্য যারা দেশ জাত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে তারা চায় গণতন্ত্র। তাদেরও আলাদাভাবে জুম্ম জাতির জন্য কাজ করার অধিকার রয়েছে। শুধু জনসংহতি সমিতি হলেই কেবল দেশ সেবা বা জাত সেবা করা যায় তা তো নয়। সুতরাং আলাদাভাবে, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজের মত করে জুম্ম জাতির জন্য কাজ করা চায়। যার যেমন খুশি তেমন সংগঠন করে জুম্ম জাতির সেবা করা আর কি। ক্ষুদ্র একটা জাতিসত্ত্বার ভেতর আটদশটা এমনকি আরো বেশী দল করার অর্থই হলো বিভক্তি, ভাঙ্গন। মূল আন্দোলনকে দুর্বল করা। এটাই যদি গণতন্ত্র হয় তা হলে আপাতত আমাদের তেমন গণতন্ত্র চর্চা না হওয়াই উচিৎ। আর তা করতে গিয়ে যখন কোন কোন বিষয় মূল আন্দোলনের সাথে সংগতিপূর্ণ না হয় বা বিরুদ্ধে যায় তখন জনসংহতি সমিতি তার বিরোধীতা করতে বাধ্য হয়। আর তখনই জনসংহতি সমিতি খারাপ, পার্টি স্বৈরতান্ত্রিক। পার্টিকে গালি গালাজ, পার্টির চৌদ্ধ পুরুষ উদ্ধার। পার্টি অগণতান্ত্রিক। পার্টি নেতৃত্ব অসহিষ্ণু। পার্টির নেতৃত্বে আন্দোলনের কেবল দুর্বল দিকগুলো নিয়ে যখন সমালোচনা করেন তা পার্টি একটু অখুশী তো হতেই পারে। তা অস্বাভাবিক তো কিছুই নয়। আন্দোলনের ভালো দিকগুলো নিয়ে সমালোচনা করতে আপনাদের বাঁধে কেন? পার্টির দ্বারা কোথায় কিভাবে কখন আপনি উপকৃত হয়েছেন তা সততার সাথে বলুন। স্বীকার করুন আন্দোলনের সুফলগুলো। খোলাখুলি বলুন আন্দোলনের দুর্বল দিকগুলো কি কি, পার্টির দুর্বলতা কি, কোথায় কি করলে ভালো হয় আর কি করলেই বা ক্ষতি। সত্যিকার অর্থে এভাবেই তো আন্দোলনকে সহায়তা করতে পারেন।

পার্টি ঐক্য চায় না। পার্টি সমঝোতা চায় না ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক এখন প্রশ্ন হলো - পার্টি কার সাথে সমঝোতা করবে? যারা পার্টির খেয়ে পার্টির বিরোধীতা করে, দ্রুত নিষ্পত্তির নামে জাতীয় নেতা ও নেতৃত্বকে হত্যা করে অবলীলায়, আন্দোলনের চরম বিরোধীতা করে যারা তৃপ্তি পায়, একটু আধটু আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বিরাট কিছু করেছে বলে মনে করে, অথবা আন্দোলনে কোন অবদান নেই এবং আন্দোলনের সকল সুফল ভোগ করে অথচ নিজেকে বিরাট জাতপ্রেমিক বা দেশপ্রেমিক ভাবে আর সুযোগ পেলেই জনসংহতি সমিতিকে তুলোধুনো করতে ব্যতিব্যস্ত তাদের সঙ্গে? অথচ আন্দোলনের নামে কানাকড়িও এরা খরচ করেনি বরং পার্টির তথা আন্দোলনের সমস্ত প্রকার সুযোগটুকু তিলে তিলে ভোগ করেছে। প্রথম থেকে এরাই কিন্তু জেএসএস বিরোধী। কারন পরিষ্কার - জেএসএস বিরোধীতা না করলে সুযোগ কোথায়? উপরোক্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে যেগুলি আর্মী বা সরকারের দ্বারা সৃষ্ট নয় সেগুলির ক্ষেত্রে পার্টি বরাবরই উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকে। এমনকি যাদের মধ্যে ১৯৮৩ সালের ষড়যন্ত্রের হোতা হিসেবে যারা খ্যাত সেই কুচক্রী নেতারাও কি আজ দিব্যি বেঁচে নেই? ওদেরও হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়া যেতো। কিন্তু তাতে কি হতো লাভ!

সুতরাং কেবল পার্টি নয় আমরাও চাই জুম্ম জনগণের স্বার্থে যতটুকু সম্ভব কাজ করে যেতে। যতটুকু সম্ভব সবাই মিলে মিশে কাজ করতে পারলে খুবই ভালো ছিল। নেহায়েত তা না হলেও মোটামুটি নিজেদের মধ্যে সখ্যতা বজায় রেখে কাজ কর্ম হোক। আর তা না হলেও অন্ততঃ নিজেদের মধ্যেকার সংঘাত এড়িয়ে আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত থাকুক। বৃহত্তর স্বার্থে জেএসএস নেতৃত্বের সাথে

আলাপ আলোচনা করে নিজেদের কর্মকান্ড চালাতে দোষের কি আছে। আপনি হতে পারেন প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্র নেতা, জননেতা, এমপি, মন্ত্রী, উপদেষ্টা, জনপ্রতিনিধি, বিত্তবান, বিত্তহীন বা রাজা-প্রজা। হতে পরেন জেএসএস আন্দোলনের কারণে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ। হতে পারেন পার্টি বিরোধী বা সমর্থক। হতে পারেন চুক্তি বিরোধী। চুক্তি করে পার্টি জাতটাকে রসাতলে ফেলে দিয়েছে বলেও আপনি হয়ত বিষোদাগার করছেন। পার্টি চুক্তি করে নাকি সার্কাস দেখাচ্ছে এমন সাক্ষাৎকারও শুনেছি বিবিসিতে। তা হোক। কিন্তু নিজে কি করেছেন সে প্রশ্ন কি করেছেন কখনও? নিজে কিনা করেছেন তা নিয়ে কি কখনো লজ্জাবোধ হয়নি? অনুতাপ নেই নিজের সীমাবদ্ধতার জন্য? আপনারা কতটুকু গণতান্ত্রিক হতে পেরেছেন তা কি আত্মজিজ্ঞাসা করেছেন? জেএসএস বিরোধীতা করে ব্যক্তির বা সামগ্রিকভাবে লাভ কি কিছু হয়? নিজের ক্ষোভ প্রকাশের জন্যই কি কেবল পার্টি বিরোধীতা? মূল কথা হলো পার্টি বা পার্টি নেতৃত্বকে পছন্দ হয় না আপনাদের। তা হলে কি করা? নিজেও বিশেষ কিছু করতে পারছেন না আর জেএসএস যা করছে তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাই পার্টি বা পার্টি নেতৃত্বকে যত্রতত্র গালিগালাজ করে তৃপ্তি পান। তাহলে নিজে কতটুকু গণতান্ত্রিক বা সহিষ্ণু তা একটু ভেবে দেখুন। তাতে জেএসএস বিরোধীতারও একটা সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষার ইতিবাচক ভূমিকা থাকতে পারতো পার্টি বিরোধীদের।

দুই.

চুক্তি বিরোধীতা কার স্বার্থে? একি আন্দোলন না আত্মহনণ? প্রসিত বাবুরা সেদিন বলল ভাল কিছু করার চেষ্টা করব, না পারলে রাজনীতি থেকে সরে পড়ব, ক্ষতি তো করবোই না। অথচ আজ কি করছে ওরা? ভাবতে অবাক লাগে বৈকি।

১৯৯৭ প্রথম দিকে শেষবারের মতো প্রসিত আর রবিবাবু এলো পার্টির সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ করতে। পার্টি ও বাইরে আন্দোলনরত কতিপয় ছাত্র ও যুব নেতার মধ্যেকার চলমান মতবিরোধ এবং বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। এর পরেও সঞ্চয়ের নেতৃত্বে আটনয় জনের একটা গ্রুপ এসেছিল। আজকের কথিত শান্তিচুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ-এর শীর্ষস্থানীয় অধিকাংশ নেতারাই ছিল তখন। এদের সাথেই সৃষ্ট মতবিরোধ মূলতঃ এক সময় তিক্ততায় পরিণত হয়। পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যতই মতভিন্নতা থাক আমাদের লক্ষ্য তো এক। সুতরাং যদি আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেকার দূরত্ব বেড়েই যায় তাহলে বুঝাপড়ার মধ্য দিয়েই হোক। অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য ঝগড়া বিবাদটাও নিজেদের জানাজানির মাধ্যমে একটা সমঝোতার ভেতর হয়ে যাক। তার মানে আন্দোলন যে যার লাইনে করবে কিন্তু নিজেদের মধ্যে সংঘাত হবে না। এইভাবে আন্দোলনকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাবো। সঞ্চয়রাও সেদিন মন খুলে প্রাণ খুলে কিছু বলেনি। বরং বলেছিল তা কি করে হয়? পার্টিই আমাদের আন্দোলনের অভিভাবক। তার নির্দেশ পরামর্শ অনুযায়ীই কাজ করবো। পার্টি অবশ্য কোন কালেই তাদের নির্দেশ দেয়নি। কারণ নির্দেশ দেয়ার তারা কে? তারা তো পার্টির কোন শপথ নেয়া সদস্য বা কর্মী নয়। পার্টির খেয়ে জুম্ম জনগণের স্বার্থে আন্দোলনে করে যাচ্ছে। অর্থাৎ পার্টির শুভেচ্ছা নিয়ে নিজেদের মত করে ছাত্র-যুবকদের নিয়ে আন্দোলনের স্বার্থে কর্মকান্ড চালাচ্ছে। তারা পার্টির নির্দেশ শোনার কে? কিন্তু পার্টি কি চেয়েছে? পার্টি চেয়েছে এই অগ্রগামী ছাত্র-যুবকরাই আগামী দিনের আন্দোলনের ভবিষ্যত। তাদের গড়ে তোলার নৈতিক দায়িত্বই পালন করতে চেয়েছে পার্টি। এদিক থেকে পার্টির কোন কার্পণ্য ছিল না। আন্তরিকতায় আপ্যায়নের ছিল না কোন খুত। বরং বলা যায় সামর্থ্যেরও বেশী মনোনিবেশ করেছে পার্টি। সংশ্লিষ্ট পার্টি সদস্যরা নিজেরা কম খেয়ে, কষ্ট স্বীকার করেও দু'হাত বাড়িয়েছিল ছাত্রদের সুখে দুঃখে।

অথচ সেই সময় পার্টির তরফ থেকে যা বলা হচ্ছিল তখন তারা সেভাবে কাজ করছিল না। ফলে চলমান শান্তি আলোচনা ও সম্ভাব্য আন্দোলনের কর্মসূচীতে ঘটে যাচ্ছিল নানান বিপত্তি। বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল তাদের কিছু কিছু কর্মকান্ড। দালাল শুদ্ধি অভিযানের পাশাপাশি তাদের অতি লড়াকু কর্মসূচীর কারণে সমাজের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পুলিশ, বিডিআর, আর্মী, অনুপ্রবেশকারী এবং জুম্ম সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে রীতিমত সংঘর্ষের ঘটনা অহরহ সংঘটিত হতে থাকে। সড়ক অবরোধ কর্মসূচীতে বাস ভাঙচুর, পুলিশের সাথে বিনা উস্কানীতে কান্তা যুদ্ধ, লাঠি নিয়ে ধস্তাধস্তি নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে অসংখ্য ছাত্র কর্মীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হয়ে যায় আর অনেকেই পুলিশি হেফাজতে চলে যায়। যার পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে দিতে হয় পার্টিকে। আজ জামিনের জন্য, কাল কেইস চালাবার জন্য ইত্যাদি। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের মধ্যেও সংঘাত চলতে থাকে। এই সংঘাত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে এক ভয়াবহ রূপ নেয়। এরই পাশাপাশি তারা গ্রামে মুরুব্বিয়ানা শুরু করে। সমাজের বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে থাকে। কেবল ছাত্র নয়, তারা বিভিন্ন গ্রামে বিচার কার্য পরিচালনা করতে থাকে। এক পর্যায়ে তো রীতিমত গণ-আদালত বসালো প্রসিত খীসা নিজে। প্রিয় কুমার চাকমা নামে একজনকে কান ধরে উঠালো বসালো তারা খাগড়াছড়ির খবংপড়িয়া গ্রামে। ঘটনা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। খাগড়াছড়ির পেড়াছড়ায় এক পার্টি সদস্যকে মারধর করে বসলো। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে পরস্ত্রীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছে। পার্টির সদস্য অপরাধ করে থাকলে তা সত্য মিথ্যা বিচার করে শাস্তির ব্যবস্থা পার্টিই করে থাকে। অথচ অবাক হলেও সত্য তারা গ্রামের বিচার আচার থেকে শুরু করে অবশেষে খোদ পার্টির গায়ে হাত দেয় আজকের ইউপিডিএফ-এর স্বনামধন্য কর্মীরা। পার্টি বরাবরই ঠান্ডা মাথায় গভীর ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে

এবং বারবার আহ্বান জানাতে থাকে যাতে নেতারা আলোচনার জন্য দেখা করতে আসে। অবশেষে জানা গেল এই চুক্তি বিরোধীরা পার্টির কিছু জুনিয়র কর্মীকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত এবং ইতিমধ্যে পার্টির বিরুদ্ধে অপ্রচার শুরু করে দিয়েছে। একদিকে সমঝোতার ভাব, পার্টির নৈতিক ও অর্থনৈতিক দুই সুবিধা লুফে নিয়েছে অন্যদিকে পার্টির বিরুদ্ধে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নেয়ার ধান্ধায় প্রসিতবাবুরা সক্রিয় হয়ে উঠে।

কি সেই ২৬টি কর্মসূচী যা ওদের মনপুত হয়নি সেদিন?

যা হোক সঞ্চয়দের সাথে মতবিনিময়ের এক পর্যায়ে তারা বলেছিলেন যে, আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমাদের বলুন কি কি করতে হবে। পার্টির পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয় তাদের কি করণীয়। যেমন -

১। জঙ্গিপনা পরিহার করে সকল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালানো।
২। ছাত্র পরিষদের বিক্ষুব্ধ অংশের সাথে খোলাখুলি আলোচনা করে তাদের মতামতকেও গুরুত্ব দিয়ে উদ্ভূত সমস্যার নিষ্পত্তি করা।
৩। ছাত্র-যুবকদের মধ্যে ঐক্য সংহতি জোরদার করা এবং আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নিয়ে আসা।
৪। প্রগতিশীল ছাত্র যুবকদের মধ্যে মূল আন্দোলনে অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে উৎসাহিত করা।
৫। সমাজে বিচার-আচারে হস্তক্ষেপ না করা এবং নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন না করা।
৬। বিচার-আচারের ক্ষেত্রে পার্টির যুব সমিতি বা পঞ্চায়েতকে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাওয়া।
৭। হিল উইমেন্স ফেডারেশনকে আরো শক্তিশালী করা।
৮। দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি অবগত করা।
৯। নিয়মিতভাবে মিটিং, মিছিল, সমাবেশ করে জুম্ম জনগণের ন্যায্য অধিকারের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।
১০। যথা সম্ভব শান্তিপূর্ণ উপায়ে অবরোধ কর্মসূচী পালন করা।
১১। বাংলাদেশের লেখক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, সাংবাদিক, রাজনৈতিক ও মানবাধিকার কর্মীদের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা।
১২। সংগঠনের পত্রিকাকে নিয়মিত করা, বিভিন্ন ঘটনায় সাংবাদিক সম্মেলন করা, বিবৃতি দেওয়া।
১৩। জাতীয়, আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি অব্যাহত রাখা এবং আন্দোলন ও জুম্মদের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।
১৪। দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সম্মেলন, সেমিনারে যোগদান করা এবং জুম্ম জনগণের অধিকারের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলা।
১৫। নিজেরাও মাঝে মধ্যে ঢাকায়, চট্টগ্রামে এবং বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে আলোচনা চক্র, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা।
১৬। বিভিন্ন দূতাবাসের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রাখা, পরিস্থিতি অবগত করা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন সরবরাহ করা।
১৭। পশ্চাদপদ জুম্ম জনগোষ্ঠী ছাত্রদের প্রতি সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা দান এবং তাদের আন্দোলনে অধিকতরভাবে সম্পৃক্ত করা।
১৮। নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে শক্তিশালী করা।
১৯। শহরের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত জুম্মদের আন্দোলনের প্রতি উৎসাহিত করা।
২০। সমাজে সুবিধাবাদী দালালদের থেকে সতর্ক থাকা।
২১। নিজেদের রাজনৈতিক মান বাড়ানোর জন্য পড়াশোনা চালানো এবং এজন্যে বই-পত্র কেনার জন্য পার্টির আর্থিক সহযোগিতা নেয়া।
২২। রোমান্তিকতা ও এডভেঞ্চারিজম পরিহার করে সুষ্ঠু ও শক্তিশালী নেতৃত্ব গড়ে তোলায় মনযোগ দেয়া।
২৩। বাইরের বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করে পার্টিকে সহায়তা করা।
২৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে কানাচে সাংগঠনিক সফরের মাধ্যমে জনসভা করে পার্টি তথা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে নিয়ে আসা।
২৫। পার্টির সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা, পার্টির ভুলত্রুটি এবং নিজেদের মতামত খোলাখুলি পার্টি নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরা।
২৬। জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে পার্টিতে যোগ দিতে অন্যদের উৎসাহিত করা এবং নিজেরাও যোগ দেয়া।

উপরোক্ত পয়েন্টগুলো পড়ে শোনানো হয় সেদিন। বলা শেষ হয়ে যখন আলোচনার জন্য আবার এক নম্বর পয়েন্ট থেকে পড়া শুরু করা হয় তখনই সঞ্চয় বলে উঠে তাহলে তো আমাদের করার কিছুই থাকল না। কেন? কিছুই করার থাকলো না মানে? তখন সঞ্চয়রা যুক্তি দেখায় যে, ছাত্ররা এখন অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে লড়াকু। ওদের এভাবে আন্দোলনে রাখা যাবে না। মিছিলে আসতে বললে তাদের এখন আমাদের বলতে হয় তৈরী হয়ে আসতে। অর্থাৎ হাতে কাস্তা, লাঠি, কিরিচ বা অস্ত্র যাতে থাকে মিছিলে। ছাত্র-যুবকদের এখন শান্ত রাখা বা মারমুখো অবস্থা থেকে ফেরানো সম্ভব নয়। তাদের জঙ্গিপনা নিরুৎসাহিত করা মানেই তাদের

আন্দোলন থেকে সরিয়ে দেয়া। তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে হলে জঙ্গিত্ব অনিবার্য। স্বাভাবিক কারণে তাদের সাথে আলোচনা আর এগোয়নি। ওরা বললো, জনসংহতি সমিতির পরামর্শ শোনা আর তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাতে পার্টিরও আশা ছেড়ে দেয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইল না। তবে কথা তবুও রয়ে গেছে।

কি সেই কথা যা প্রসিতবাবুরা সেদিন দিয়েছিল?

ওরা বলেছিল সামর্থ যা আছে তা দিয়ে জুম্ম জাতির ভাল কিছু করার চেষ্টা করবে আর ভাল কিছু করতে না পারলে রাজনীতি থেকে সরে যাবে। বসে যাবে। অর্থাৎ একটা সাদামাটা জীবন বেছে নেয়া আর কি। আমরাও তাই ভেবেছিলাম ভুল করে। প্রসিতবাবুরা ভাল কিছু করার চেষ্টা করবে অন্ততঃ। আর তা যদি নাই বা পারে তাহলে নিশ্চয়ই ক্ষতি করবে না। অথচ ভাবতে অবাক লাগে কি হতে কি হয়ে গেলো। বিগত পাঁচটি বছরে ওরা আমাদের মোট ৫১ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিগত ২৪ বছরে এই গড়পরতায় পার্টি কর্মী মরেনি কখনো। অপহরণ করেছে অহরহ। জনসংহতি সমিতি যাতে মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তার জন্য তারা করেনি এমন কোন কাজ নেই। দীর্ঘ বছর কঠোর আত্মত্যাগের মাধ্যমে সীমাহীন কষ্টের মধ্যে যারা আন্দোলন করে এসেছে তাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে প্রসিতের বাহিনী। অপরাধ? তাদের ভাষায় চুক্তি করে জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে। তাই নিজের ছেলে, নিজের ভাইয়ের হাতে জীবন বলি দিচ্ছে এককালের সাহসী, লড়াকু শান্তিবাহিনীর কর্মী বন্ধুরা।

কি নির্মম পরিহাস। জনসংহতি সমিতিকে তো ধ্বংস করা সম্ভব নয়। তবুও যদি ধরা যাক জনসংহতি সমিতি খতম হয়ে গেল তারপরও কি পারবে প্রসিতবাবুরা জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করতে? তোমাদের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন আদায় হবে কি জেএসএসকে নির্মূল করতে পারলে? ভাবতে বড়ই অবাকই লাগে। ভরসা করা তো দূরে থাক ন্যূনতম বিশ্বাস করাই মুর্খতা। বড়ই ভয় হয় তোমাদের নিয়ে। কিছু অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আজ যে দাপট দেখাচ্ছে তাতে তো মনে হয় তারাও সেই 'সুরতন' রাজ্যের স্বপ্নে বিভোর। বিচিত্র এই পৃথিবী। বিচিত্র এই সময়। ভাবতে বড়ই অবাক লাগে। শুভ বুদ্ধির উদয় কবে হবে?

কারা এই চুক্তি বিরোধী? কারাই বা ইউপিডিএফ? মূলত সবাই জেএসএস বিরোধী।

খুব দুঃখের হলেও একথা সত্য যে, যারা জনসংহতি সমিতি থেকে কোন না কোনভাবে কোন না কোন সময় শুভেচ্ছা পেয়েছে তাদের মধ্যেই পার্টি বিরোধী প্রবণতা বেশী পরিলক্ষিত হয়। আর যারা পার্টির সাথে তেমন সংশ্রব রাখেনি বা পার্টির কোন সুবিধাও ভোগ করেননি তারা সাথেও নেই পাশেও নেই। আর যারা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কর্মী দ্বারা কোন না কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তারা স্বাভাবিকভাবেই পার্টি বিরোধী। যদিও কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে। তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামের যে শ্রেণীটি আন্দোলনের জন্য একটু আধটু ক্ষতিগ্রস্থ বা আন্দোলনের জন্য বড় বেশী লাভবানও হয়েছে তারা বরাবরই আন্দোলনের পরিপন্থী ভূমিকায় লিপ্ত। এরাই অতি ভয়ংকর। এরাই নেতৃত্বকে নির্দ্বিধায় হত্যা করতে পারে। নিজের পায়ে কুড়াল মারতেও এদের তেমন যায় আসে না। কেবল ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে এই তথাকথিত জাত দরদী গোষ্ঠী গুরুতর ক্ষতি করতে কোন দ্বিধা করে না। দীর্ঘকাল আন্দোলনের কারণে জুম্ম জাত সামগ্রিকভাবে চরম ক্ষয়ক্ষতির শিকার। এর মধ্যে যারা সুবিধাবাধী শ্রেণী তারা বরাবরই জেএসএস বিরোধী। অথচ আন্দোলনের সুফল যদি কেউ ভোগ করে থাকে তাহলে এই শ্রেণীটাই বেশী ভোগ করেছে এবং এদের মধ্যে যারা পার্টির সাহায্য-সহযোগিতা সরাসরি পেয়েছে তারাই বেশী পার্টির বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এদের মধ্যে ছাত্র, যুবক, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে চাকুরীজীবী, পেশাজীবী এমনকি পার্টির নতুন পুরাতন অনেক কর্মীও রয়েছে। ব্যাপারটি সুখকর না হলেও কিন্তু মোটেই অবাস্তব কিছু নয়। কেবল কুৎসা রটনা বা তুলোধূনোর মধ্যে থাকলেও বোধ হয় উদ্বেগের কিছু ছিল না। তা এখন খুনোখুনির মধ্যে পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ জেএসএস সমর্থক, কর্মী , নেতা যে কোন মুহূর্তে হয়ে যাচ্ছে খুন। লাঞ্ছনার তো সীমা পরিসীমা নেই।

জীবন প্রদীপ খীসাকে অপহরণ এবং অপদস্থ করার ঘটনা খুবই মর্মান্তিক। পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে জীবন প্রদীপ হলেন অন্যতম সাহসী, নির্ভীক, নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। একজন আদর্শবান কর্মীর জীবন কাহিনী লিখতে হলে উনার মতো মানুষদের নিয়েই লেখা যায়। নীতিবান, কঠোর সংগ্রামী, আত্মত্যাগী প্রতীম বাবু (পার্টির নাম)-কে অপহরণ করলো পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনপন্থীরা। অপরাধ জেএসএস কর্মী। অপরাধ সুর্দীঘকাল জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের আন্দোলনে আত্মনিবেদিত জীবন কাটিয়েছেন জীবন প্রদীপ। চুক্তির পর যার মাথা গুজাবার ঠাঁয়টুকুও নেই। এককাঠা জমি নেই তার। আত্মীয়-পরিজন থাকলেও পাননি তেমন সাহায্য সহযোগিতা। চলমান ঘুনেধরা মূল্যবোধের বিচারে উনি হলেন অন্যতম বোকা। অর্থাৎ এ যুগে নিঃস্বার্থ হওয়া যে কত বড় বোকামী তিনিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বড়ই অদ্ভুত। তার চেয়েও অদ্ভূত হচ্ছে এ অবস্থার জন্য তার কোন অনুশোচনা নেই, নেই কোন অভিযোগ। কারো প্রতি নেই কোন অভিমানও।

এটা অবশ্য কমবেশী সকল আন্দোলনেরই বাস্তবতা। ব্যক্তিগত কিছু আশা করে আন্দোলনে যাওয়া যায় না। বরং ধরে নিতে হবে আন্দোলনে ভালো করুন আর খারাপ করুন ধিক্কার, কুৎসা, সমালোচনা এমন কি যে কোন আঘাত অবশ্যম্ভাবী। প্রাণনাশ তো হতেই

পারে। তবুও আমরা আহত হই। অনেক ত্যাগ স্বীকার করে যখন কিছু লোক কেবল বিরোধীতা নয় রীতিমত চরম আঘাত করতে ব্যতিব্যস্ত। কথিত শান্তিচুক্তির ফলে আমরা কেউ বেশী কিছু আশা করিনি। তারপরও অনেকেই ভেবেছে যা আদায় করা যাচ্ছে তা নিয়ে মোটামুটি জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের গতিকে একটা ভিত্তির উপর দাঁড় করানো যাবে। বাকীটার জন্য সাধ্যমত আন্দোলন করতে হবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। আর কেহ যদি সশস্ত্র আন্দোলন আবার শুরু করতে চায় তা করুক। জুম্ম জাতির অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অধিকতর শক্তিশালী হোক আমরা সবাই মনে প্রাণে চাই। আঞ্চলিক পরিষদ থেকে আরো বেশী কিছু পেতে আমাদের কারো আপত্তি নেই। তাই সাদামাটা একটা জীবন কাটানোর ইচ্ছা ছিল জেএসএস কর্মীদের অনেকের। কিন্তু না তা যে হবার নয়। চুক্তির পর প্রথম আঘাত আসে নিজের জাত ভাইয়ের থেকে। না আর্মী, না সেটেলার, কেহ না। অথচ এরাও কি মনে প্রাণে চেয়েছে শান্তিচুক্তি? না। তবুও চরম আঘাত করে বসে ইদানিং কালের কথিত নেতা প্রসিত খীসার সংগঠিত ইউপিডিএফ এর চেলা চামুন্ডারা। ইতিমধ্যে নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছে ৫১ জন জেএসএস কর্মী ও সমর্থক এই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনপন্থীদের হাতে। নিগৃহীত হয়েছেন অনেকেই।

কিছু কিছু লোক আছে যারা আদতে না পূর্ণ স্বয়ত্বশাসনপন্থী না প্রসিতপন্থী। কিন্তু জেএসএস বিরোধী নানা কারণে। তবে সাধারণভাবে জেএসএসকে বিরোধীতা করাই যেহেতু এদের কর্ম তাই তারাও আজকাল প্রসিতপন্থী। অর্থাৎ চুক্তি বিরোধী। তবে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ যাই বলি না কেন মূলত এরা জেএসএস বিরোধী শিবির। এদের ধারণা হচ্ছে জেএসএসই সকল অপকর্মের মূলে। জেএসএস-এর জন্য আজ জুম্ম জাতির দূর্দশা, অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি, শান্তিচুক্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। জেএসএসকে খতম করতে পারলেই এদের শান্তি। পূর্ণস্বায়ত্বশাসন অর্জন করতে পারবে পার্টিকে ধ্বংস করতে পারলে। যদিও আপাতত দু'টোই অবাস্তব। জেএসএসকে ধ্বংস করাও সম্ভব নয় আর জেএসএসকে ধ্বংস করেও পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন অর্জন করা অবাস্তব। একথা সত্য যে নেহায়েত জেএসএস বিরোধীতাকে পুঁজি করে যে আন্দোলন তার ফলাফল সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। সচেতন জনসাধারণকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। না হলে প্রসিত চক্রের আত্মঘাতী তৎপরতায় আমাদের সামগ্রিক ক্ষতি অনিবার্য।

তিন.

নিজের চরকায় তেল না দিয়ে আমাদের আগুনে ঘি ঢালতে এতোই আগ্রহ কেন ওমর ভাইদের? চুক্তি বিরোধীদের সাথে মাখামাখি হওয়ার স্বার্থটা কোথায়?

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, যা লিখতে যাচ্ছি বা যাদের বিপক্ষে লিখতে যাচ্ছি তা মোটেই ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য নয়। খ্যাতনামা বামপন্থী নেতা ও লেখক বদরুদ্দিন ওমর বা আনু মুহম্মদ বা অন্য যারা আজ প্রসিত-সঞ্চয় চক্রকে উদার হস্তে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন তাদের হেয় প্রতিপন্ন করারও কোন কারণ নেই। একান্তভাবে নিজের দুঃখ বেদনা ভারাক্রান্তি থেকে মুক্তিও নয়। একজন অতি সাধারণ পাঠক হিসেবে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে আজকের গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট এবং বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের বিভিন্ন লেখা রচনা, সাহিত্য, পত্রপত্রিকার সাথে পরিচয়। পরবর্তী পর্যায়ে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ও। তখন বাইরে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বা গণ পরিষদ জোরদার আন্দোলন করছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদকে যারা অক্লান্তভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নেতা এবং পরবর্তীতে বাসদের কেন্দ্রীয় নেতা মোস্তফা ফারুক একেবারেই অন্যতম। উনি এমনভাবে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কর্মকান্ডে উৎসাহ দিতেন যে কোন সময় মনে হত উনি ছাত্র পরিষদেরই নেতা। এর পাশাপাশি ছাত্র ইউনিয়নের নাসির উদ্দোজা। পরবর্তীতে ছাত্র ফ্রন্টের বেলাল, ছাত্র ফেডারেশনের ফয়জুল হাকিম লালা সবাই আন্তরিকভাবে সহায়তা করেন। ওরাও যে কেবল তাদের নিজেদের ছাত্র সংগঠনে পাহাড়ী ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য তা করতেন তা কিন্তু নয়। নীতিগতভাবে তারা সক্রিয় সহযোগিতা দিতেন। এমনিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম ইস্যুতে এইসব নেতাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রশ্নে অশেষ আন্তরিকতা ছিল, ছিল একাত্মতাও। তখনকার সময়ের জুম্ম ছাত্ররা এই সব জাতীয় পর্যায়ের ছাত্র নেতাদের অবদান চিরদিন স্মরণ রাখবে।

'৯২ সালের লোগাং হত্যাকান্ডের পর থেকে ছাত্র নেতাদের পাশাপাশি আরো এগিয়ে আসেন অনেক অনেক বামপন্থী নেতা। শিক্ষক, সাংস্কৃতিক কর্মী, আইনজীবী, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মীরাও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা দেশবাসীর নিকট তুলে ধরতে সক্রিয় হন। এই সময় থেকেই বদরুদ্দিন ওমর ও আনু মুহাম্মদের অনেক লেখা প্রকাশিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে। উনারা বরাবরই জেএসএস-এর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু জাতিসত্ত্বাদের অধিকারের আন্দোলনকে নানাভাবে সমর্থন দিয়েছেন। আর এ কারণেই শান্তিবাহিনীর সমর্থনপুষ্ঠ রবি, প্রসিত, সঞ্চয়দের আন্তরিকভাবে সহায়তা করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ জাতীয় কমিটি গঠনের সময়ও উনারা ছিলেন একান্তভাবে সক্রিয়। সেই সক্রিয় সহযোগিতা আজ আর নেই বলবো না। বরং বলা যায় আগের তুলনায় সমর্থনের মাত্রা বেড়ে গেছে। যখন প্রসিত-সঞ্চয় চক্র প্রথম হাতিয়ার তুলে নেয় জেএসএসকে হত্যা

করতে তখনো আমার সাধারণ মাথায় এর কোন সুনির্দিষ্ট যুক্তি আসে না। কেন তারা এখন জেএসএস-এর বিরুদ্ধে প্রসিত চক্রের সকল বর্বরতাকে নিরবে সমর্থন করে যাচ্ছে। জুম্মদের নিজেদের মধ্যে যে আজ চরম শত্রুতা এবং হিংসাত্মক তৎপরতা চলছে তাতে কি উনারা মোটেই বিচলিত বোধ করেন না? প্রসিত চক্র যে আজ তার তথাকথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের লড়াইয়ে শান্তিবাহিনী সদস্যদের প্রতিনিয়ত হত্যা, অপহরণের মত চরম বিরোধীতা করছে তাতে কেন উনাদের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা?

জেএসএস চুক্তি করে তো মনে হয় উনাদের সাথেও বেঈমানী করে বসে আছে। তার জন্যই কি প্রসিত চক্রক প্রত্যক্ষ সহায়তা দান? আমার মাথায় আসলেই এসবের সঠিক উত্তর আসে না। অবশ্য উনাদের যুক্তি বরাবরই অখন্ডনীয় বটে। যদিও এ মূহূর্তে আমার সেই সব অকাট্য যুক্তি জানা নেই। তবে সাধারণভাবে যা মনে হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আর যত কিছুই আকুতি-কাকুতি বা সক্রিয় সমর্থন তাদের থাক না কেন প্রসিত চক্রের চিহ্নিত প্রধান শত্রু শান্তিবাহিনী বা জেএসএস সদস্যদের হত্যার রাজনীতিকে অবহেলা করা কোন প্রকৃত মার্কসবাদীর সম্ভব নয়। সমর্থনের প্রশ্ন তো আসতেই পারে না। যদি জুম্ম জনগণের মঙ্গল তারা কামনা করেন তাহলে প্রসিতবাবুদের খুনোখুনীর খেলা বিরোধীতা করাই উচিৎ। না অতীব দুঃখের হলেও সত্য উনারা এখনো কেবল ওদের (প্রসিত চক্রের) সাথে সক্রিয় যোগাযোগই নয় রীতিমত সক্রিয় সহায়তায় সদাব্যস্ত। প্রসিত চক্রের স্বার্থের সাথে তাদের স্বার্থের কোথায় মিল? এখনো কি কেবল নীতিগত সম্পর্ক নাকি আরো অন্য কিছু। যদি থেকে থাকে সেটাই বা কি সেটা তো মাথায় আসছে না।

নীতিগত প্রশ্ন হলেও তো আমাদের ভ্রাতৃঘাতী পরিস্থিতিতে মদত দিতে পারেন না তারা। সামগ্রিক অর্থে তারা জুম্ম জনগণের বন্ধু হওয়ারই কথা। প্রসিত চক্র তাদের নীতি আদর্শগত বন্ধু হতেই পারে। কিন্তু প্রসিত চক্রের হিংসাত্মক কর্মপদ্ধতি কোন কারণেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে এটা ভাবতেই কষ্ট হয়। উনারা যে নীতি আদর্শের প্রবক্তা সেই নীতি আদর্শের শত্রু জেএসএস হতেই পারে না। তাহলে তবু যারা আজ জেএসএসকে নির্মূল করার রক্ত শপথ নিয়ে হত্যার লীলা খেলায় মত্ত তাদের সাথে দহরম মহরম সম্পর্ক কোন বিবেকের তাড়নায়। ইউপিডিএফ-এর সভা সম্মেলনে যোগদানের অধিকার নিশ্চয়ই আছে উনাদের। কিন্তু ক্ষুদ্র জাতির সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার নৈতিক দায়দায়িত্বকে তো এড়িয়ে যাওয়া যায় না। জেএসএস ভালবাসুন সে কথা কখনোই বলি না। কিন্তু যারা জেএসএস উৎখাত করতে বদ্ধপরিকর তাদের সাথে এতো মাখামাখিই বা কেন? তাহলে কি আমাদের আভ্যন্তরীণ সংকটকে উস্কে দেওয়ার মত হয়ে যাচ্ছে না? কখনো কখনো তাই ভাবি উনারা নিজের চরকায় তেল না দিয়ে আমাদের আগুনে ঘি ঢালতে এতই আগ্রহী কেন?

অনেকের অভিযোগ জেএসএস প্রসিত চক্রের কোন কালেই নেতা ছিল না। তাদের নেতা গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটের নেতারা। কিন্তু এই বিষয়টাও আমাদের মত মূর্খরা বিশ্বাস করে না। কারণ একটাই। আর তা হল আমরা জানি প্রসিত চক্রের নেতা প্রসিতই। প্রসিতের নেতা প্রসিতই। রবি শংকর নামক কর্মীদের কাছে প্রসিত মহান মাও সেতুং এর মত নেতা হতে পারে বটে কিন্তু প্রসিতের নেতা সে নিজেই। তাহলে ওমর ভাইরা কি? বুর্জোয়া রাজনীতিতে নাকি স্থায়ী শত্রু মিত্র বলতে কিছু নেই কিন্তু উনারা যে আদর্শের কথা বলেন সেখানে তো শত্রু-মিত্র একেবারেই সুনির্দিষ্ট। আর তাহলেই কি প্রসিত চক্র যে রাজনীতির ধারক বাহক বা যে শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছে সেটাই উনাদের বন্ধু। প্রসিত চক্র কি? তারা কার প্রতিনিধিত্ব করছে? কোন শ্রেণীর স্বার্থে আত্মনিবেদিত সেটাও বিরাট প্রশ্নবোধক। কার হয়ে কার বিরুদ্ধে লড়ছে? ওমর ভাইদের মত খ্যাতনামা বামপন্থী তাত্ত্বিকদের নিশ্চয়ই ব্যাপারটি আলোর মত পরিস্কার। পরিস্কার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শ্রেণী বা আদর্শ ইত্যাদি সাহিত্যের কথা বললে তো প্রসিত বা রবিবাবুরা মহাভারতের মত বই লিখে যেতে পারে এমন তাদের পান্ডিত্য।

জেএসএস শান্তিচুক্তি করে নাকি আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে। প্রচলিত আমলাতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে নাকি তার চরিত্র বদল করেছে। ব্যাপক জুম্ম জনগণের স্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে চুক্তি করে। এই হলো উনাদের মতামত। এটা প্রসিত চক্রেরও মতামত। বিচার বিশ্লেষণে, মূল্যায়নে ওমর ভাইরা এক ও অভিন্ন। যত কিছুই অভিন্নতা থাক কিন্তু যা করলে আমাদের অর্থাৎ জুম্ম জনগণের ক্ষতি সেটা কামনা করবেন না। একমাত্র এই ভিন্নতাটা থাক প্রসিত চক্রের সাথে ওমর ভাইদের সেটাই কামনা করি।

আমরা জানি বাংলাদেশের বাম রাজনৈতিক দলগুলো আজ অনেক বহুধাবিভক্ত। স্বাভাবিকভাবে দুর্বলও। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোটও যথেষ্ট দুর্বল। এই জোটকে শক্তিশালী করার জন্য মনোযোগ দেয়া অধিকতর জরুরী সে কথা নিশ্চয়ই ওমর ভাইদের বলতে হবে না। যেটা বার বার বলা উচিৎ তা হলো আমাদের গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে আপনারা যোগ না দিলেই আমাদের মঙ্গল। কিন্তু প্রসিত চক্রকে সহযোগিতা দেয়ার অর্থ যদি মনে করেন জুম্ম জাতিকে অধিকার আদায়ে সমর্থন দিচ্ছেন তাহলে বোধ হয় সেটা ভুল। কারণ প্রসিত চক্রের এখন মূল কর্মসূচী হলো জেএসএস খতম। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের জন্য হলে এগিয়ে আসুন তাতে সবার শুভেচ্ছা থাকবে। শান্তি চুক্তি জুম্ম জনগণের আন্দোলন শেষ হতে পারে না সেটা আপনাদের চাইতে আমরা বরং বেশী জানি। যেটা জানি না তা হচ্ছে চুক্তি বিরোধী নামের প্রসিত চক্রের সাথে আপনাদের স্বার্থের মিলটা কোথায়?

চার.

প্রয়াত প্রখ্যাত লেখক আক্তারুজ্জামান আমাদের প্রিয় ইলিয়াস ভাই একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা কি সত্যিই বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস করি কি-না। উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই আবার বলেছিলেন ব্যক্তিগতভাবে তার তাতে কোন আপত্তি নেই। তবে কিনা একটা অনুরোধ রোমান হরফ ব্যবহার না করে আমাদের বাংলা হরফ ব্যবহার করতে হবে আমাদের ভাষার উন্নয়নের জন্য। কারণ দীর্ঘকাল বাংলার সাথে যে সম্পর্ক তার ভালো অনেক দিকও রয়েছে। ইংরেজীর চেয়ে বাংলা স্ক্রিপ্ট-এ আমাদের ভাষা লিখতে সহজ হবে। উনি তখনো ঢাকা কলেজে পড়াতেন। মনে মনে বলেছিলাম ইলিয়াস ভাই সত্যি বলতে কি স্বাধীনতা কে না চায়। তবে সেই স্বাধীনতা সার্বভৌম নয় হয়তো। সেই স্বাধীনতা হলো অত্যাচার থেকে; ভূমি জবর দখল থেকে; সেই স্বাধীনতা জাতিগত নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বাস্তবতা নেই বলেই আমরা আপাতত বিচ্ছিন্নতার প্রত্যাশা করি না।

প্রসিতবাবুরা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের জন্য মরণপণ লড়াইয়ে সদা ব্যস্ত। ভাবতে অবাক লাগে তাদের লড়াইয়ে মুখ্য শত্রু এখন জনসংহতি সমিতি(জেএসএস)। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন পেতে হলে প্রথম আঘাত করতে হবে জেএসএস-এর উপর এই হল তাদের রণনীতি। তাই ভাবতে অবাক লাগে কি হতে কি হলো। কিন্তু ভালো কথা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কেন স্বাধীনতাই বা কে না চায়। শক্তি, সামর্থ্য এবং সেই বাস্তবতা নেই বলেই তো আজ এই আঞ্চলিক পরিষদ। তাছাড়া এই চুক্তির জন্য প্রসিতবাবুরাও যে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী তা কি তারা আদৌ ভেবেছে? সে কথায় পরে আসব। তার আগে বলা দরকার আঞ্চলিক পরিষদ বা সীমিত স্বায়ত্বশাসন আমরাও চাই না। কথিত শান্তিচুক্তিতে আবদ্ধ জেএসএসও বলুক তারা এই আঞ্চলিক পরিষদ মনেপ্রাণে চেয়েছে কি-না। সাধারণ জনগণও নিশ্চয়ই চায়নি। কিন্তু তারপরও শান্তিচুক্তি তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। এখনকার সময়ের জন্য এটাই বাস্তবতা। প্রসিতবাবুরা কি ধরনের পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন চায়? সেটা আদৌ পরিস্কার নয়। তিনি কিন্তু জেএসএস-এর পাঁচদফার সমর্থক। কেবল সমর্থক বললেও কম বলা হয়। জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় জেএসএস-এর সশস্ত্র বাহিনীতে যোগ দেয়া তো তার জীবনের একমাত্র প্রতিজ্ঞা। আমরা যখন শান্তিবাহিনীতে না যাওয়ার কথা বলতাম তখন তারা ক'জন অবাক হয়ে যেতো। মনে হতো এটা কিরকম একটা অসম্ভব কথা বলে ফেললাম। শান্তিবাহিনী তথা সশস্ত্র সংগ্রামে নিজেকে নিবেদিত রাখাটাই তখনকার সময়ে একমাত্র চাওয়া পাওয়া। সে যাই হোক, মনে করতে হবে তার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন মানে জে এসএস-এর পাঁচদফা। নাকি তার অন্য কোন ফর্মূলা আছে? তাহলে সেটাই বা কি? সেটা যদি নতুন কিছু হয়ে থাকে তাও আমাদের জানা দরকার। তার বাস্তবতা কি তা জানলেও তো ক্ষতি নেই। প্রসিতবাবুরা হয়তো তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায়নি। আর তা হল -

১। তাদের এই আন্দোলন কেন?
২। তাদের এই আন্দোলন কার বিরুদ্ধে? এবং
৩। তাদের এই আন্দোলন কাদের নিয়ে?

উত্তরও বলে দেয়া দরকার যদি না তারা জানেন।

১। এই আন্দোলন জুম্ম জনগণের অধিকারের (অধিকারের মাত্রা অনির্ধারিত। শান্তিচুক্তি আঞ্চলিক পরিষদও হতে পারে। আবার পাঁচদফাও হতে পারে। এমনকি স্বাধীনতাও।)
২। এই আন্দোলন বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে এবং
৩। এই আন্দোলন অবশ্যই জুম্ম জনগণকে নিয়ে।

উত্তর যদি তাই হয় তবে বলতে হবে প্রসিতবাবুরা আপনারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছেন। প্রথমতঃ বলতে হয় '৮৯ সালে যখন জনবিরোধী পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ হচ্ছিল সেই সময়ে ৪ঠা মে লংগদু গণহত্যার প্রেক্ষাপটে গঠিত হয় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ - যা আজ দ্বি-খন্ডিত। তখন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ বাতিলের আন্দোলনে আপামর জনগণের ব্যাপক সমর্থন ছিল। বলা যেতে পারে তখন কেবল ৯১ জন তখনকার সময়ের চামছা ছাড়া ইব্রাহিমের মত সেনা কর্তার সৃষ্ট নয়দফা রূপরেখা কেহ সমর্থন করেনি, বিশ্বাস করেনি। অথচ ভাবতে অবাক লাগে আমরা তা বাতিল করতে পারিনি। '৯০-এর গণ-আন্দোলনের পর সর্বসম্মত সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আহম্মদ রাঙ্গামাটি গিয়ে সবাইকে রীতিমত অবাক করে অপ্রত্যাশিতভাবে সেই গণবিরোধী জেলা পরিষদ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে আসেন। শতকরা ৯৯% এরও বেশী লোকের প্রচণ্ড বিরোধীতার মুখেও দিব্যি টিকে গেছে সেদিনের জেলা পরিষদ। আর আজকে কম করে হলেও ৯৯% মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থনে গড়ে উঠা আঞ্চলিক পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া এবং জেএসএস খতম করার আন্দোলন কেবল হাস্যকরই নয় রীতিমত বাড়াবাড়িও।

ধান ভানতে শিবের গীত না করে আসল কথায় আসা যাক। বলছিলাম প্রসিতবাবুদের আন্দোলন কেন। নিশ্চয়ই অধিকারের জন্য। সেই অধিকার কথিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনও হতে পারে। যদিও আজো জানি না সেই পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের মানেটা কি। মাত্রাও বা কি

তার। তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে জুম্ম জনগণের আন্দোলন করার যে মাত্রায় ত্যাগের মানসিকতা সে মাত্রা দিয়ে এই আঞ্চলিক পরিষদ পাওয়া যায় মাত্র, এর বেশী আশা করা বৃথা। অপরদিকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও যেহেতু বাংলাদেশ সরকার তাই এই সরকার এই টুকুই দিতে পারে তার বেশী নয়। অর্থাৎ আঞ্চলিক পরিষদ পর্যন্ত। প্রসিতবাবুরা বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির কাছে যদি আঞ্চলিক পরিষদ-এর চেয়েও বেশী কিছু আশা করে তাহলে আমাদের কিছুই করার নেই। আওয়ামী লীগ থেকে তো আঞ্চলিক পরিষদ পাওয়াটাও যথেষ্ট। তবে প্রসিতবাবুরা নাকি গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট নাকি যেন একটা আছে তার থেকে পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন কামনা করে। ভাবতে এসব রীতিমত হাসি পায়। অবশ্য সেই দূরাশা প্রসিতবাবুরা করবে না বলেই বিশ্বাস। তৃতীয় প্রশ্নটার উত্তর যেহেতু জুম্ম জনগণ কাজেই সেই জনগণের অবিচ্ছেদ্য অংশ তো প্রসিতবাবুরা নিজেরাই। তাহলে আন্দোলন করে দেখুন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে পড়ে। ভালো কিছু করতে পার তার শুভ কামনা করি।

পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন বাদই দিলাম আঞ্চলিক পরিষদের থেকে কিছু বেশী হলেও তথাস্তু। কিন্তু পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের নামে ইদানিং যা করছে তা আর যাই হোক ভালো বা নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল গোয়ার্তুমী দিয়ে নেতার কর্তৃত্ব বা ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা যায় না। এযাবৎ প্রসিত তার বিশুদ্ধ নেতৃত্ব দিয়ে কি যে দিতে পেরেছে? ছাত্র জীবনেও প্রসিত যা করেছে তা হলো বিভেদ, ভাঙ্গন, বিক্ষুব্দ গোষ্ঠীর জন্ম দেয়া এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপজাতীয় ছাত্র পরিষদ দ্বিধাবিভক্ত করার ক্ষেত্রে সরাসরি দায়ী প্রসিত খীসা। পরবর্তীতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদসহ গণ পরিষদ এবং হিল উইমেন্স ফেডারেশন দুই ঠুকরো হওয়ার পেছনেও প্রসিত খীসা নির্মমভাবে দায়ী। ও থাকলে কথিত ইউপিডিএফও অনিবার্য খন্ডিত হবেই হবে। তার কথায় সত্য পৃথিবীতে একটাই। দুটো সত্যের অস্তিত্ব থাকতেই পারে না। এবং সে যা ভাবে, করে একান্তই জুম্ম জনগণের জন্যই। এই সত্যের বিপরীতে সবই দালালী, স্বার্থবাদী এবং মিথ্যা।

অতএব তার দেশপ্রেম জাত প্রেমই সাচ্চা। অন্যদের দেশপ্রেম জাতপ্রেম থাকলেও নিখাদ নয়। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগ্রাম করতেই হবে সে যদি খুনের রাজনীতিও হয়। সমাজে কোন অংশ পঁচা থাকলে তার সমূলে উচ্ছেদ না করে উপায় নেই। যদিও তার মুখে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়। সেটা হলো মাথায় রোগ হলে তো আর কেটে বাদ দেয়া যায় না! জুম্ম সমাজে এক সময় ছিল গণদুশমণ জেলা পরিষদের চামচারা আমাদের জাতীয় শত্রু। তাই তাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে তাদের গায়ে মল মূত্র, থুথু, পঁচা ডিম ছুঁড়ে মারা গোপন সার্কুলার দিয়ে ছিল প্রসিতবাবু। কিন্তু এসবই ছিল মূল কর্মসুচী থেকে জনগণকে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের অপচেষ্টা মাত্র। এযাবৎ প্রসিত যা দিয়েছে তা হলো মূল কর্মসূচী বাদ দিয়ে আদতে দালাল বিরোধী তৎপরতা মাত্র। অর্থাৎ সত্য প্রতিষ্ঠা। সংগঠনে যেমন রয়েছে শুদ্ধি অভিযান তেমনি রয়েছে দালাল খতম করার চারু মজুমদারের লাইন। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় কমিটির ন্যায় প্রিয় কুমারকে গণ আদালতে বিচার করা থেকে শুরু করে চোর ধরে মাথা ন্যাড়া করে জুতোর মালা পড়িয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়ে শাস্তি দেয়ার মত রোমান্তিক শুদ্ধি অভিযানের কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে ছিল প্রসিতবাবুরা। আজো তাই দেখছি।

দালালী করা অবশ্যই ক্ষতিকর সামগ্রিক স্বার্থে। পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রসিতবাবুরা আজ যা করছে তা যে কয়েক হাজার গুণ ভয়ানক। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্রথম যেটা তার চাইতে তা হচ্ছে জেএসএসকে নির্মূল করা এটা রণকৌশল হতে পারে না। তাহলে কি এটা রণনীতি? যদি তাই হয় তবে এটা ধ্বংসের। এই নীতি না বদলালে সার্বিকভাবে পরিণতি খারাপ। কারণ জেএসএস আজ নিরস্ত্র হলেও তার উপর আঘাত আসলে তা থেকে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে বাধ্য। প্রয়োজনে মরিয়া হয়েও জেএসএস প্রতিরক্ষার্থে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে বাধ্য সাধারণ মানুষে সমর্থন না পেলেও। কারণ মরতে কে চায়? সুতরাং যে জেএসএস-এর আন্দোলনের গর্ভে তোমাদের জন্ম। জেএসএস-এর নূনও খেয়েছ বিস্তর। সেই জেএসএস-এর গুণ না হয় নাইবা গাইলে অন্ত ত তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কত বড় বেঈমানী তা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। এর পরিণতিও কখনো শুভ হতেই পারে না। এ কোন সেলুকাস। নেমকহারাম আর কাকে বলে!

আজকের আঞ্চলিক পরিষদ বা কথিত শান্তিচুক্তির জন্য কেবল জেএসএস নয় প্রসিতবাবুরা দায়ী। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা আর কি। আশির দশকের গোড়া থেকেই প্রসিতবাবুদের জেএসএস নৈতিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা দিয়েছে একথা কারো অজানা নয়। বাইরে ছাত্র আন্দোলন দাঁড় করানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জেএসএস একান্তভাবে নিবেদিত ছিল। এই নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে আজকের পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আন্দোলন। এমন এক সময় ছিল যখন প্রসিতবাবুদের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে অনেক কিছুরই সামাল দিয়েছে পার্টি। এমনকি প্রসিতবাবুদের নিরাপত্তার জন্য গুন্ডা ভাড়া করার টাকা দিতে হয়েছে জেএসএসকেই। এসব ভাবতে লজ্জা হয় বৈকি। একেই বলে দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা। মূল কথা হল জেএসএস-এর শুভেচ্ছা নিয়ে, তার কাঁধে ভর করে একটা বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলার লালিত স্বপ্ন প্রসিতবাবুকে বরাবরই আচ্ছন্ন করে রাখত। কথায় কথায় আন্ডার গ্রাউন্ডে যাবার মিথ্যা বুলি, পার্টির প্রতি তার মেকি আনুগত্য এবং পার্টির শুভেচ্ছা কাজে লাগিয়ে ছাত্রদের মাঝে নিজের অবস্থান পোক্ত করার চেষ্টা করে গেছে নীরবে নিভৃতে। তবে স্কুল জীবনেই গড়ে তুলেছিল আদর্শ সবুজ সংঘ। পরবর্তী পর্যায়ে গড়ে তুলে পার্বত্য যুব ও ছাত্র সংহতি সংঘ

নামের গোপন আখড়া। জেএসএস-এর আর্থিক সহায়তায় এই আখড়ার জন্ম হলেও জেএসএস কোন দিন জানতে পারেনি এর গোপন কর্মসূচী। জেএসএস এর চোখে ধুলো দিয়ে একান্ত গোপনে গড়ে তোলা এই সংঘ ক্রমে ক্রমে কিছু আত্মনিবেদিত ছাত্র কর্মীর জন্ম দেয় যারা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। এদের অনেকেই আজ আর প্রসিতবাবুর সাথে নেই। সাথে না থাকার একমাত্র কারণ প্রসিতবাবুকে মানতে না পারা নয়। বিভিন্ন কারণ আছে। প্রসিতবাবু অবশ্য প্রায়ই বলত - সময় এলে গাছে অনেক ফুল ধরে কিন্তু সব ফুল ফলে পরিণত হয় না। খুবই সত্য কথা। তবে এখন দেখি সব ফুল ফলে পরিণত না হয় সত্য কিন্তু যে সব ফল হয়ও তার মধ্যে আবার পোকাক্রান্ত হলে যে কি ভয়ংকর হতে পারে তার জাজ্বল্য উদাহারণ প্রসিতবাবু নিজেই। আর বেশী পেকে গেলেও মহাবিপদ। অর্থাৎ জাত প্রেমের নেশাটা যদি মাতাল করে দেয় তার পরিণতিও মারাত্মক। প্রসিতবাবুরা এখন দুটোর যে কোন একটা। হয় আধাপাকা হয়ে রোগাক্রান্ত বা অতি ঝুনো ফলে পরিণত হয়ে পচে বসে আছে। দুটোয় আমাদের সমাজে এখন ভয়ানক পঁচন ধরাচ্ছে। আর না হলে খুনোখুনির মরণ খেলায় মেতে উঠবেই বা কেন তারা?

মূল কথায় ফিরে আসা যাক। পার্টি শান্তিচুক্তি করতে বাধ্য হওয়ার পেছনে প্রসিতবাবুরাও দায়ী বলেছিলাম। কিন্তু কেন? আজ হোক কাল হোক সশস্ত্র সংগ্রামে নিজেকে সমর্পিত করার রক্ত শপথ নিলেও প্রসিতবাবু নিজে কখনো জেএসএস-এর সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়ার দৃঢ়তা দেখায়নি। তার সশস্ত্র সংগ্রাম কিভাবে, কার নেতৃত্বে সে কথা কোন কালেই খোলখুলি বলেনি প্রসিতবাবু। কিন্তু দুর্ভাগ্য. জেএসএস-এর স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাশা ছিল এই ক্ষুদে উদীয়মান নেতা একদিন অবশ্যই সশস্ত্র আন্দোলনে যোগ দেবে। তখনো তার উচ্চাভিলাষী চেহারাটা প্রকাশ পায়নি। জেএসএসই বা বলি না কেন। সাধারণ ছাত্র যুবক কর্মীরাও মনে করত অন্য কেউ না গেলেও প্রসিতবাবু জেএসএস-এ যোগ দেবেই। '৯৩ সাল থেকে জেএসএস নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে পার্টিতে যোগ দেয়ার আহ্বান জানালে প্রসিতবাবু বরাবরই এড়িয়ে গেছে। ক্রমে প্রসিতবাবু নিশ্চয়ই বুঝতে পারে যে জেএসএস তখন ঠিক কি চাইছিল। এর পর থেকে তালবাহানা শুরু।

পার্টির কর্মসূচীর সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন এমন কাজ শুরু করতে থাকে। গ্রামে গ্রামে তার মুরুব্বিয়ানা বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ বিচার-আচার থেকে শুরু করে ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আদলে তথা কথিত গণ আদালত পর্যন্ত বসায় প্রসিতবাবু নিজে। শান্তি আলোচনা চলাকালে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে যখন পার্টি দালালদেরও নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টায় জড়িত তখন প্রসিতবাবুরা দালাল বিরোধী কর্মসূচী দিয়ে জেএসএস-এর প্রতি দৃষ্টতা দেখাতে থাকে। ঘন ঘন অবরোধ, হরতাল ইত্যাদি কর্মসূচী দিয়ে শান্তি প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টির পাঁয়তারা করতে থাকে। প্রিয় কুমারের মত ব্যক্তির সাথে জেএসএস নেতার সাক্ষাৎ হওয়ার নিতান্ত ই মামুলী ঘটনাকে কেন্দ্র করে পার্টির সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি করে। পার্টির সাথে মতভিন্নতা দেখিয়ে পার্টির সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটানোর সেই যে চেষ্টা এক পর্যায়ে এসে সেটা এখন রীতিমত শত্রুতায় পরিণত করে প্রসিত পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের রঙিন ফানুস উড়িয়ে জনগণকে নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন নয় স্বাধীনতার মোহে থাকলেও কারো কোন ক্ষতি বা আপত্তি নেই। আপত্তিটা তখনই যখন ওরা পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠায় জেএসএসকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে আঘাত আর হত্যার লীলা খেলায় মাতোয়ারা। দোহাই এই খেলা বন্ধ করো প্রসিতবাবু। তোমার রাজনৈতিক জীবনে ক্যারিয়ারের জন্যও তা মঙ্গল। কিছু জেএসএস বিরোধী মানুষকে নিয়ে খুন, চাঁদাবাজী, অপহরণ আর জেএসএস খতম করার মাধমে পূর্ণস্বায়ত্বশাসন অর্জনের দিবা স্বপ্ন বাস্তবের মুখ তো দেখবেই না বরং এই আন্দোলনে আপামর জনগণকে পাওয়া যাবে না।

জেএসএস-এর অনেক ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু তোমরা তো গোড়াতেই ভুল করে বসে আছো। শান্তিচুক্তি মানো না ভালো কথা। কিন্তু জেলা পরিদের সময়কার বিরোধীতার মত এই চুক্তি এবং জেএসএস এর বিরোধীতা করার বাস্তবতা এখন নেই। শান্তিচুক্তির সমর্থন না করেও জুম্ম জনগণের অধিকতর স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখা যায়। জেএসএস বা শান্তিচুক্তি না হয় আমলই দিলে না কিন্তু তাতেও তো পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন যাই বলুন সেই আন্দোলন জিইয়ে রাখা যেত। জনগণকে আজ হোক কাল হোক সাথে পাওয়া যেত। কারণ শান্তিচুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। আর একারণেই পার্টি তার আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে। শক্তি সামর্থ্য যা আছে তা দিয়ে সংগ্রাম এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রসিত খীসার বাবা অনন্ত বিহারী খীসারও এখন মরণকালে হরিনাম। এই জ্ঞানপাপী ভদ্রলোকটি বলতেন জেএসএস মৃত ছেলে নিয়ে কান্নাকাটি করছে। অর্থাৎ জেএসএস এর আন্দোলন বৃথা। অথচ ভাবতে অবাক লাগে ছেলের সাথে উনিও ইদানিং পূর্ণ স্বায়ত্বশানের আন্দোলনে সদা তৎপর। তা তিনি এখন কি নিয়ে কান্নাকাটি করতে বসলেন? মরা ছেলে নাকি মরে ভূত হয়ে যাওয়া ছেলে নিয়ে? কোনটা?

জেএসএস শান্তিচুক্তি করে জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে বললেও বলুন। কিন্তু তা আপনারা এতকাল কি কি করেছেন কিইবা করতে যাচ্ছেন। অনন্ত বিহারী খীসার তো এতকাল আন্দোলনে সক্রিয় না হয় হলেন খুব বেশী সহযোগিতা তো করেননি। আন্দোলন প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলেন বটে কিন্তু সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতার কথা বাদ দিলাম সহমর্মিতাও তো দেখাতে পারেননি। বেছে নিয়েছিলেন একটা সাদামাটা একান্ত নিভৃত শিক্ষকতার জীবন। সুতরাং আন্দোলন থেকে বেশী আশা করেন কোন দুঃখে? বৃহত্তর স্বার্থে কাজ করতে যথেষ্ট উদারতার প্রয়োজন। এসব লিখতে খুবই খারাপ লাগছে। কিন্তু এ মূহূর্তে এসব

বলা খুবই জরুরী। পড়তে গিয়ে হয়ত ভাবতে পারেন ব্যক্তিগত আক্রমণ হয়ে গেল। তা মনে করুন। কিন্তু এটাই সত্য। শান্তিচুক্তি সবার মত আমার জীবনেও তেমন কিছু আনতে পারেনি। কিন্তু শান্তিচুক্তির বিরোধীতা কেবল আমার নয় সমগ্র জুম্ম জাতীয় জীবনে অপরিসীম ক্ষতির কারণ হচ্ছে। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের আগে এর থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে। নইলে ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘুরে যাবে। অর্থাৎ পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন দূরে থাক এই আঞ্চলিক পরিষদও হারাতে হবে। জনগণের বন্ধু হতে হলে তাদের স্বার্থে কর্মসূচী ঠিক করুন। নিছক জেএসএস বিরোধীতাকে পুঁজি করে আন্দোলনের কোন ইতিবাচক দিক নেই। এই সত্যটাই আজ বুঝা উচিত। যেন তেন আন্দোলন নয়। জুম্ম জনগণের স্বার্থ নিয়ে রোমান্টিক স্বপ্নে বিভোর হওয়া চলে না।

দুই যুগের সশস্ত্র সংগ্রাম যখন আঞ্চলিক পরিষদে মুখ থুবড়ে পড়েছে ঠিক সেই জায়গা থেকে গাদা বন্দুক দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপ্ন কতটুকু বাস্তবসম্মত তার বিস্তর সন্দেহ থেকে যায়। তবুও মানুষ আশা নিয়েই তো বাঁচে। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে ক্ষতিই বা কি। আমরাও মনে প্রাণে সে স্বপ্ন দেখতে কিংবা তারও বেশী আশা করি। পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের প্রথম কাজটা যদি জেএসএস-এর উপর আক্রমণ হয় বিপত্তি তখনই। প্রসিতবাবু, জুম্ম জনগণ আর আগের মতো নেই। বিদ্যায় বিশ্লেষণে এখন অনেক অনেক অগ্রসর। তারা এখন অনেক জটিল এবং কুটিলও বটে। তাদের মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে বেশী বোকা বানানো যাবে না। গোটা বিশ্বটাই আজ বড়ই জটিল প্রক্রিয়াধীন। সমাজের চেহারাও বদলে গেছে। এ সময়ে অন্তত তোমার নেতৃত্বে নতুন কিছু আশা করে না। তোমার ছেলেমানুষী নেতৃত্বে নির্ভর করা যায় না এটাই তাদের কাছে পরিষ্কার। জেএসএস যেখানে পাঁচদফা দাবী নিয়ে আন্দোলন এবং আলোচনায় ব্যস্ত ঠিক সেই মূহূর্তে ঢাকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সমাবেশে তোমার পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের (নয়া রূপ কথার গল্প) ডাকের জোরে ব্যাপকভাবে অহেতুক আঘাত আর নানিয়ারচরে তোমারই গোয়ার্তুমির কারণে ঘটে যাওয়া ১৭ নভেম্বর গণহত্যা আমাদের বার বার আপনার নেতৃত্ব সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়।

অতএব বাস্তব সম্মত নীতি-কৌশল ঠিক কর। জনগণকে নেতৃত্ব দিতে হলে রোমান্তিকতা পরিহার কর। শত্রু-মিত্রও চিহ্নিত করতে হবে। পরিস্কার কর্মপদ্ধতি ঠিক কর। চাঁদা তুল আপত্তি নেই। আমরাও আগের মত দিতে না পারলেও যা পারি চাঁদা দেবো। কিন্তু দোহাই খুন খারাবীর নেশা যাতে না পেয়ে বসে। খুন খুনের জন্ম দেয়। হত্যা হত্যার। বড় বেশী জাতপ্রেমিক হওয়াও ভয়ংকর বিপদের। সময়টা খুবই খারাপ। এসবই আমার চাইতে তোমার বেশী জানা আছে। তবুও লিখলাম। কেবল মনের জ্বাল মিটাতে নয়। প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে। না হলে নিজেও ডুববে জাতটাকেও ডুবাবে। সময়টা বড়ই নিষ্ঠুর।

জেএসএস আর পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনপন্থীদের মধ্যে আপাতত দ্বন্দ্বটা যদিও শান্তিচুক্তির নামে অপূর্ণ স্বায়ত্বশাসন এবং পূর্ণ স্বায়ত্বশাসনের মধ্যে কিন্তু আসলে সমস্যা অন্যখানে। না হলে শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হলেও পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন পন্থীদের তেমন কি-বা ক্ষতি? কারন তারা তো যেটা অপূর্ণ রয়ে গেছে সেটাই অর্জন করার জন্য লড়াই করছে। অন্যদিকে পূর্ণস্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা হলে জেএসএস-এরও কি ক্ষতি? তাহলে তো দ্বন্দ্বটা অন্যখানে। প্রসিত নেতৃত্ব যা চায় তা হল - জেএসএস-এর অধীনে নয় নিজেরই নেতৃত্বে একটি দল নিয়ে জুম্মদের অধিকতর অধিকার অর্জন করা। মূলত জেএসএস-এর যে রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক যোগ্যতা তা তার মনপুত হয়নি কোন কালে। তার ধারণা হচ্ছে জেএসএস-এর চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও বাস্তবতা বিবর্জিত। যেমন দালাল বিশুদ্ধি অভিযান। দালাল মুক্ত না করলে পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায় সম্ভব নয়। অতএব দালাল নির্মূলই অধিকার অর্জনের প্রথম ধাপ। পথের কাঁটা সরিয়েই এগুতে হবে। দালালরাই পথের কাঁটা। কিন্তু অধিকার অর্জনে দালালদেরও পক্ষে আনার বা নিরপেক্ষ করার জেএসএস-এর কৌশল তার সন্তোষজনক হয়নি। দালালদের সাথে কথাবার্তা বলা মানেই তাদের মতে আসকারা (তাদের ভাষায়) দেওয়া, তাদের সাথে মাখামাখি হওয়া। তাদের সাথে কথা বলার অর্থই আপোষ করা। দালালদের সাথেও আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াও প্রসিত নেতৃত্ব একটি মহান দায়িত্ব বলে মনে করে। অথচ সে যা চায়নি তাই করেছে জেএসএস প্রধান। অর্থাৎ তার কথামত জেএসএস চলেনি বলেই সে নাখোশ হয়ে যায়। তখন থেকেই তালবাহানার পর্বটা শুরু। জুম্ম জনগণের এক বিরাট অংশ আজো জেএসএস-এর সমর্থক। এই অংশকে বাদ দিয়ে তো আর আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই তাদের জেএসএস বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। যা কিছুই খারাপ জেএসএস-এর ছিল বা আছে তা তুলে ধরতে হবে এবং সাথে সাথে জেএসএসকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। অতএব হত্যার লীলা খেলা খেলতেই হবে।

আমাদের জন্য যেটা সবচেয়ে দরকার সেটা হলো প্রকৃত জাতপ্রেম। জুম্ম জাত নিয়ে তথাকথিত রাজনীতিকে নিছক পেশা বা নেশা করে সেবা করা যায় না। আর রাজনীতিটা তো প্রসিতবাবুদের একটা নেশা এবং পেশাও হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানিং। তাই ছাত্র পরিষদ, গণ পরিষদ বা জেএসএস সবকিছু বাদ দিয়ে মনগড়া একটি সংগঠন ইউপিডিএফ খুলে বসে আছে। তার এই ইউপিডিএফ গঠন করতে তখন কজন জুম্ম জনগণ তা জানত? কজনকেই বা সম্পৃক্ত করতে পেরেছে প্রসিতবাবু? গুটিকয়েক ছাত্র-যুবককে নিয়ে নানা নামে সংগঠন (দোকান?) খুলে বসা যায় কিন্তু আপামর জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে তেমন ভূমিকা রাখতে পারা চাট্টিখানি কথা নয়। তার এই সংগঠন নিয়ে কি স্বপ্ন তার তা আমার জানা নেই। তবে একথা পরিষ্কার যে ব্যাপক মানুষের মনে এর কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ মানুষের স্বপ্নই আসল। তারা এই সময়ে কি চায়? কি-বা তাদের স্বপ্ন? কি তাদের আশা-আকাংখা প্রসিতবাবুদের কি জানা

আছে? কতিপয় জেএসএস বিরোধীকে নিয়ে চাঁদাবাজী করা যায়, জেএসএস-এর নেতা কর্মীও খুন করা যায় বটে পূর্ণ-স্বায়ত্বশাসন অর্জন করা সম্ভব নয়। এটাও একটা সত্য। তবে আত্ম জিজ্ঞাসা বলে প্রসিতবাবুদের ডিকশনারিতে কোন কালেই কোন শব্দ ছিল না। আর বারে বারে মার খাচ্ছে প্রসিত ঠিক এই জায়গাতে। নিজেদের ভুলত্রুটি সম্পর্কে কোন সময়েই তার আত্মবিশ্লেষণ নেই।

শান্তিচুক্তি করে জেএসএস যেমন মহান কিছু করে বসেনি তেমনি বড় কিছু খারাপও বা কি করেছে? যে আশা নিয়ে এতকাল অপরিসীম ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে আন্দোলন করে এসেছে সে অনুযায়ী জেএসএস বেশী কিছু এনে দিতে পারেনি এই শান্তিচুক্তিতে এ কথা হয়তো অনেকেই বলবেন। কিন্তু চুক্তি করে জেএসএস জুম্ম জনগণের সাথে বেঈমানী করেছে, জুম্ম জনগণের স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়েছে বলে আজ যারা সোচ্চার, জুম্ম জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অতীতে এবং বর্তমানের অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে তাদের ভূমিকাটাই বা কি ছিল, কি আছে জানতে ইচ্ছে হয়। আন্দোলনের সুফল তো তারাই ভোগ করেছে এতকাল তারাই যারা আজ জেএসএসকে তুলোধুনো করতে ব্যতিব্যস্ত। আজ যে জনগণ তিলে তিলে আন্দোলনের কারণে সীমাহীন অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করেছে, চরম আত্ম ত্যাগ করেছে তারা তো জেএসএস-এর উপর আজো আস্থা-বিশ্বাস রেখে বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিয়েছে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী জেএসএস-এর আন্দোলনে সক্রিয়, জেএসএস নেতৃত্বের কাছেই সপে দিয়েছে তাদের ভাগ্য। এই অতি সাধারণ নিরীহ মানুষদের এই অসাধারণ ভূমিকার মূল্য সত্যিই মহান। এতকাল আন্দোলনে তারা কবল দিয়েছে, হারিয়েছে সর্বস্ব। আমরা তাদের কিছুই দিতে পারিনি। এই শান্তিচুক্তিও না। আন্দোলনের কানাকড়ি সুফলও তারা পায়নি। অথচ খুবই দুঃখজনক হলেও সত্য যারাই এই আন্দোলনে সুফল ভোগ করেছে কানায় কানায় তারাই জেএসএস বিরোধীতায় এক পায়ে খাঁড়া। নিজেদের কর্মীদের না খাইয়ে লক্ষ টাকা খরচ করে উন্নত চিকিৎসা দিয়ে জীবন যাদের বাঁচিয়েছে পার্টি, উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেছে, ছোট বড় অনেক চাকুরী (পিওন কেরানী থেকে শুরু করে রাষ্ট্রদূত পর্যন্ত) বা ছোটখাট ব্যবসা সৃষ্টি করে দিয়েছে। দেশে-বিদেশে উচ্চ শিক্ষার অসংখ্য বৃত্তি সবই তো আন্দোলনের ফল। মেম্বার, চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে এমপি, মিনিষ্টার হতে সাহায্য করেছে যে পার্টি সেই পার্টিকে আজ তারাই লাথি মারছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক পরিণতি কি হতে পারে? কথাগুলো লিখছি বলে হয়তো কারো কারো খারাপ লাগতে পারে ।

জেএসএস-এর বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের সাথে যোযোগাগ প্রসিতবাবুর দীর্ঘদিনের ছিল। যখনি দেখা করতে তাদের নিয়ে যাওয়া হতো তখন সম্মান, আন্তরিকতা, আদর, আপ্যায়নের কোন ত্রুটি থাকত না। ঢাকা বা চট্টগ্রাম যেখান থেকেই তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সর্বপ্রকার সামর্থ্য দিয়ে জীপ নতুবা কার ভাড়া করে রাজকীয় অবস্থায় অতিথির মত করে নিয়ে যাওয়া হত। সুভাষ, সোহেল, যতনদের মত কেন্দ্রীয় অফিসের কর্মীরা কতদিন যে নাওয়া খাওয়াহীন অবস্থায় দীর্ঘ নৌপথ ভর রোদে পুড়ে ঝড়ে ভিজে এসব ছাত্রনেতাদের অভ্যর্থনা দিয়েছে তা যদি প্রসিতের অনুগামী বন্ধুরা স্বচক্ষে দেখত তাহলে বুঝতে পারত কি সম্মান তারা পার্টির কাছে পেত। নজিরবিহীন ব্যবস্থাপনায় এবং নিরাপত্তা দিয়ে ভেনুতে যখন তারা পৌঁছে যেত শীতকাল হলে গরম পানিতে স্নান করতে দেয়া হত। সার্বক্ষণিক নিয়োজিত হত পার্টি কর্মী তাদের সুবিধার জন্য। মুখ ধোঁয়ার পানি এমনকি পায়খানা করার সময় বদনায় পর্যন্ত পানি ভরে দিত দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্টি কর্মীরা। স্বয়ং পার্টি সভাপতি শত ব্যস্ততার মধ্যেও তাদের ব্যবস্থাপনায় তদারকি করতেন। আর প্রতি সকাল বিকাল ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনারে দুর্লভ সব খাবার যোগাড় করে পরিবেশন করে আপ্যায়ন করত পার্টি কর্মীর মা বোনেরা। ঢাকা চট্টগ্রামের নিত্যদিনের জীবন যাত্রায় যা যা প্রয়োজন টুটব্রাশ, টুটপেস্ট, সাবান, তোয়ালে থেকে শুরু করে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করা হত তারা যাতে কষ্ট না পায়। তাদের প্রতি যে সম্মান আর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হতো তা পার্টির অন্য কোন উচ্চ পর্যায়ের নেতা কর্মীও পেত না। আলোচনা শেষে ফিরে যাবার সময় হাতে তুলে দেয়া হতো প্রয়োজনীয় ফান্ড। ছাত্র পরিষদ, গণ পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এবং তাদের নিজস্ব নানা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যে বাজেট তারা নিয়ে আসত প্রতি বারই সেই বাজেটের অধিক অর্থ দেয়া হত।

নিখাদ এই আন্তরিকতার মধ্যে একটাই প্রত্যাশা ছিল যে, এই ছাত্রনেতারা জুম্ম জনগণের জন্য কাজ করছে, পার্টির জন্যই কাজ করছে এবং একদিন পাটিতে যোগ দেবে। এরাই পরবর্তী পার্টির কর্ণধার হবে। অথচ বাস্তবতার কি চরম পরিণতি এই বন্ধুরাই আজ পার্টি নেতা ও কর্মীদের অপহরণ করছে, নির্মমভাবে হত্যা করছে। পার্টি আজ তাদের প্রধান শত্রু। অপরাধ একটাই। তা হলো শান্তি চুক্তি কেন করলো পার্টি। যুদ্ধ কেন করলো না পার্টি। যুদ্ধ কাকে দিয়ে করবে পার্টি? ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ পার্টি আকুল আহ্বান জানায় শিক্ষিত ছাত্র যুব সমাজের প্রতি সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেয়ার। তখন প্রসিতবাবুদের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে উঠে এক পর্যায়ে গতানুগতিক ধারায় ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। সম্ভবত শতকরা ২ ভাগ ছাত্রও যোগ দেয়নি পার্টিতে তখন। সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে কোন কালেই প্রসিতবাবুরা কাউকে উৎসাহিত করেনি। উল্টো ছাত্র-যুবকদের রাজপথে মিছিলে, মিটিংয়ে ব্যতিব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করেছে। এর উদ্দেশ্য একটাই আর তা হলো ছাত্র-যুবকদের মাঝে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং জেএসএস'কে শক্তিশালী করতে না দেওয়া। কিন্তু দূর্ভাগ্য তা হয়নি। হয়েছে তার উল্টো। প্রসিত যেদিকে গেছে সেদিকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে সংগঠন। ব্যাপক ছাত্র-যুবকদের নেতাও হতে পারেনি প্রসিত, জননেতা তো দূরে থাক।

পাঁচ.

'৮৪ সালের শেষ দিকে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির প্রবল আশা নিয়ে ক'জন বন্ধুর সাথে ক্যাম্পাসের কাছাকাছি ভাড়া বাসায় মেস করে থাকতো জীবন। অন্য বন্ধুদের তিনজনই আইএসসি পরীক্ষার্থী। তাই ক্যাম্পাসের হলগুলোতে অবস্থানরত বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করতে প্রায়ই একা আসা যাওয়া করতো জীবন। কোন কোন দিন অবশ্য দিলীপ, সুচিত্ত ও ম্যাজিক্সসহ চার জনই হলে বেড়াতে যেত। বিকালে আড্ডা জমত আলাওল হলের উত্তর পার্শ্বের কটেজগুলোতে। বিকালে আড্ডার আসরে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা পায়ে হেঁটে কখনো পায়ে চলা পথে, কখনো বা রেল লাইনের পথ ধরে রুমে ফিরত ওরা। বেশ আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল দিন। ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জীবনের বেশ ভয় ছিল। শেষ পর্যন্ত ভর্তি পরীক্ষায় টিকে যেতে না পারলে ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত। শত শত মেধাবী ভর্তিচ্ছুদের ভেতর নিজেকে অসহায় মনে হত। কিন্তু একদিন সত্যি সত্যি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে নূতন এক জীবন শুরু হয় জীবনের। মেসের অন্য বন্ধুদের ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেল স্টেশনের পাশে 'শোভন ছায়া' কটেজে চলে যায় সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্টাফদের ব্যক্তিগত মালিকানায় অনেক ঝুপড়ি ধরনের কটেজ তৈরী করা হয়েছে। ক্রেমলিন, হোয়াইট হাউস, বুশ হাউস, পদ্মা, শান্তিনিকেতন ইত্যাদি নানা নামে গড়ে উঠেছে অস্থায়ী অসংখ্য ছাত্রাবাস। 'শোভন ছায়া' কটেজের মালিক বাংলা বিভাগের ডঃ দেলোয়ার হোসেন। সিট ভাড়া মাসিক ৭০ (সত্তর) টাকা হারে গণিত বিভাগের দেবাশীষসহ কটেজ জীবন দিয়েই জীবনের ক্যাম্পাসের দিনকাল শুরু।

পুরনো সেই মেসের বন্ধুরা সবাই আজ বিচ্ছিন্ন। দিলীপ বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবন শেষ করে কর্মসংস্থানের লাগামহীন যানে চড়ে বেকারত্বের দুঃসহ জীবন কাটাচ্ছে। সুচিত্ত ছোটখাত একটা চাকরী নিয়ে উত্তর বঙ্গে। আর ম্যাজিক্স! সেই যে কবে কানাডা চলে গিয়েছে তার আর কোন পাত্তা মেলেনি। কটেজ জীবনে পরে আরো যোগ দেয় মনিষ। মনিষও আজ বহু বহু দূরে। গিয়েছিল অষ্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাতে স্কলারশীপ নিয়ে। ওখানে থাকতে থাকতেই পরিবারসহ ইমিগ্রান্ট হয়ে নিউজিল্যান্ড পাড়ি জমিয়েছে। ডিপার্টমেন্টের অন্য দু একজন বন্ধু শাহরিয়ার (বাবলু), হুমায়ুন এখন ব্রাসেলসে। ওরা জীবনের শুধু ঘনিষ্ঠ সহপাঠীই নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শগতভাবেও একান্ত কাছাকাছি। নিপীড়িত ও নির্যাতিত খেটে খাওয়া মানুষের জন্য সংগ্রাম করার কথা বলত ওরা। তাদের সাথেও আজ আর যোগাযোগ নেই। ভবিষ্যতে যোগাযোগ হবার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই। এসব ভাবতে ভাবতে জীবনের আর ঘুম আসে না।

পাহাড়ের দেশে রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। গভীর অরণ্যে নেমে আসে 'হাইড আউট' এর শীতকালীন কষ্টকর রাত। চারদিক বরফ শীতল পরিবেশ। ভুলংতলী মৌনের এই নিষিদ্ধ, নিভৃত অরণ্যে কনকনে শীত হৃৎপিন্ডেও যেন কামড় দেয়। একটা ছেড়া পুরনো কম্বল আর বুরগী (গিলাপ) গায়ে জড়িয়ে শীতের মোকাবেলা করার ব্যর্থ চেষ্টা অব্যাহত থাকে। মশারী নেই। উপরে নেই কোন ছাদ। খোলা মহাশূন্যই ছাদ। উন্মুক্ত মাটির পৃথিবীই বিছানা। প্রচন্ড ঠান্ডায় প্রকৃতির সব কোলাহল বুঝি বা জমে গেছে। কুয়াশা জমতে জমতে শিশির বিন্দু। অতঃপর পাতায় পাতায় টুপটাপ করে পড়ার বিক্ষিপ্ত শব্দ ছাড়া রাতের এই নিঃশব্দটাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোন নিশাচরের ডাকও শোনা যাচ্ছে না। পাশে মুকুল দা আর নিটো দা কম্বল জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দই পরিপার্শ্বের গোটা পরিবেশটাকে গুমোটভাব এনে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগেও মুকুল দা যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করছিল। অদ্ভূত মনে হয় এ মানুষদের। অনেক কিছু ত্যাগ করে জীবন বাজী রেখে আজ তারা দীর্ঘ বছর জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের লড়াইয়ে নিবেদিত সৈনিক। বছরের পর বছর এরা গেরিলা সংগ্রামের কষ্টকর সময় পাড়ি দিয়েছে স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। সংগ্রামী চেতনা তাদের নিরন্তর তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ক্লান্তিহীন অথচ কন্টকাকীর্ণ লড়াই পরিচালনা করে যাচ্ছে। না মোটেই ঘুম আসছে না জীবনের। খানিকটা দূরে বড় একটা চাপালিশ গাছের তলায় লালন সেন্ট্রি দিচ্ছে। রাত দু'টো পনেরোয় সেন্ট্রি বদল হবে। পালাক্রমে সেন্ট্রিতে যাবে দেব, উদয়ন দা। ভোর রাতে জীবনের ডিউটি আসবে। ক্রমেই ঘুটঘুটে অন্ধকার আর নিঃশব্দটা গ্রাস করে যায় ভুলংতলী মৌনের আশপাশ।

সবে ক্লাশ শুরু হয়েছে। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বন্ধুদের সাথে তখনো পুরোপুরি জানাশোনা হয়নি। সব মিলিয়ে ৪২ জন জুম্ম ছাত্র ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। চট্টগ্রাম ভিত্তিক যে জুম্ম ছাত্র সংগঠন ছিল তা থেকে নবীন বরণ করা হয়নি তখন। তবুও প্রথম বর্ষের জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে একটা সম্মিলনী করার লক্ষ্যে মূলতঃ শিবশীষ আর প্রসিত পিকনিকের উদ্যোগ নেয়। পিকনিক স্পট পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত। যথারীতি আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্ব শুরু হলে প্রত্যেকেই যে যার বক্তব্য তুলে ধরে পরিচয় দেয়। কম বেশী জীবনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কথাও প্রকাশ করল। শিক্ষা জীবন শেষ করে জুম্ম জনগণের কল্যাণে অবদান রাখার অঙ্গীকারের সুর শোনা গেল অনেকের মুখে। যেহেতু শিক্ষিত যুব সমাজই পারে কোন জাতির ভাগ্যোন্নয়নে অধিকতর আত্মত্যাগ করতে। উচ্চ শিক্ষিত ছাত্র সমাজের উপর স্বাভাবিকভাবে বর্তে যায় জাতীয় জীবনের অপরিসীম দায় দায়িত্ব। অধিকার আদায়ের দুর্গমনীয় পথে তারাই এগিয়ে যাবে দৃপ্ত শপথ নিয়ে। এটাই যুগের দাবী। এটাই নিয়ম। ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী ছাত্র সমিতি স্বাধিকার অর্জনের যে সংগ্রামের ডাক দিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল যেভাবে, ঠিক একইভাবে নব প্রজন্মের শিক্ষিত যুবকরা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে এটাই স্বাভাবিক।

পূর্বসুরীদের আত্মত্যাগ উত্তরসুরীদের অনুপ্রেরণা যোগায়। তাদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের ফলেই পরবর্তী প্রজন্মের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। তাই আজকের দিনের জুম্ম জনগণ যেভাবে যে পরিমাণে আত্মত্যাগ করবে ঠিক সেই পরিমাণে আগামী দিনের প্রজন্ম উন্নত হবে-সুখী হবে। এভাবেই একটি জাতি উন্নততর অবস্থানের দিকে এগিয়ে যায়। ভবিষ্যতের সব কিছু নির্ভর করছে বর্তমানের উপর। কাজেই সেদিন লেখাপড়া ফেলে স্বাধিকারের স্বপ্ন লালন করে যারা সংগ্রামে নেমেছিল তাদের জন্য আজকে বন্ধুরা লেখাপড়া করতে পারছে। আন্দোলনে আত্মোৎসর্গ করতে গিয়ে আজ যারা বড় আমলা, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী ইত্যাদি কিছুই হতে পারেনি একমাত্র তাদের জন্যই সে যুগের অন্য বন্ধুরা তাই হতে পেরেছে। কলেজ জীবনের অনেক বন্ধুর মত সুশীল, নীলব্রত বা বিল্টুরা আন্দোলনে আত্মত্যাগী হয়েছে বলেই প্রদীপ, প্রধীর, প্রসিত বা শিবাদের মত অনেক বন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছে। শিলা, উর্মিদের মত অনেক বান্ধবী আজ উচ্চ শিক্ষায় আলোকিত, যেহেতু লালসা, জ্ঞানরূপাদের মত অসংখ্য বান্ধবী অনেক কিছু ত্যাগ করে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। যেমনি রাত দিনের কিংবা অন্ধকার আলোর পূর্বশর্ত তেমনি সব কিছুই সম্পর্কিত মনে হয় জীবনের।

সাগড় পাড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন সবাই যেন শপথ নিয়েছিল ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সামগ্রিক স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ হবে। অঙ্গীকার আর আনন্দ সেদিন সবাইকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজনের পর বিকেল বেলা গান গেয়ে শোনায় বান্দরবানের স্বল্পভাষী বন্ধু নীলু। ভুপেন হাজারিকার "আয় আয় ছুটে আয় সজাগ জনতা" গানটি বেশ নাড়া দিয়েছিল সবাইকে। পতেঙ্গার সেই প্রথম পিকনিকের আনন্দঘন স্মৃতি জীবনকে আরো আলোড়িত করে। পুলকিত শিহরণে হারিয়ে যাওয়া ভালোই লাগে। ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনার সময় তিন বার পিকনিক করতে বঙ্গোপসাগরের এই বিস্তীর্ণ উপকূলে আনন্দমুখর সময় কেটেছে। তবে ফার্স্ট ইয়ারের প্রথম থেকেই সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে যাওয়া। ছাত্র বন্ধুদের পাশপাশি ছাত্রীদেরও সাংগঠনিক কার্যক্রমে জড়িয়ে নেবার জন্য উৎসাহিত করা শুরু হয় তখন থেকে। তাই উপলক্ষ্য পিকনিক হলেও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সবাইকে সংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ। চিত্ত-বিনোদনের ভিতর দিয়ে চেতনার বিকাশ আর চিন্তার সমন্বয়। সেই চেতনা হল জুম্ম জাতীয়তাবাদের, জাত ও দেশপ্রেমের। শোষিত বঞ্চিত সংখ্যালঘু পাহাড়ীয়া জাতিসমূহের অপেক্ষাকৃত তরুণ শিক্ষিত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করা। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবানের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বেড়িয়ে আসা শিক্ষিত ছাত্রছাত্রীদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সংহতি স্থাপন। পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের অনুভূতিগুলো মেলানো। নিজেদের ভ্রাতৃপ্রতিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করা। সবার মধ্যে দেশপ্রেম ও জাত প্রেমের রোগ ছড়িয়ে দেয়া। অর্থাৎ জাতীয় চেতনাবোধ জাগিয়ে দেওয়া। এই দেশপ্রেম ও জাতপ্রেমের রোগ যতবেশী সংক্রমিত করা যায় ততই ভাল বলে বিশ্বাস ছিল সংগঠকদের।

এ কাজে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে প্রসিত আর শিবাশীষ। পরবর্তীতে প্রদীপ, প্রশান্ত, মংথোয়াই, শিশির, সুইনু, লীলা, দেব ও শক্তিসহ অনেকেই বিপুল উদ্যোমীর ভূমিকায় এগিয়ে আসে। বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক জুম্ম ছাত্র সংগঠনটি অধিক মাত্রায় সুসংগঠিত ও গতিশীল করতে নিরলস নিয়োজিত ছিল এরা সবাই। যদিও শেষদিকে খাগড়াছড়ি ব্রিগেডের ব্রিগেডিয়ার ইব্রাহিমের কুটচালে দিশেহারা হয়ে প্রশান্ত চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে সংগঠন থেকে বেড়িয়ে যায়। অথচ রাজনৈতিক সংগঠনটির পাশপাশি একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন 'হিল লিটারেচার ফোরাম' করার সময় প্রশান্তও বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। আর তখন প্রাণভরা উৎসাহ-উদ্দীপনা আর সৃজন প্রয়াস সবাইকে সর্বক্ষণ তাড়িত করত। মনে ছিল অসীম স্বপ্ন আর সৃষ্টির প্রেরণা। দ্রুতই এগিয়ে গিয়েছিল সংগঠনটির কার্যক্রম। জুম্ম সমাজের গতানুগতিক সাংস্কৃতিক ধারাকে বদলে দিয়ে এক নূতন সংগ্রামমূখী মাত্রা যোগ করতে চেয়েছিল সবাই। প্রচলিত সংস্কৃতি চর্চার ধারাকে ভেঙ্গে দিয়ে এক নূতন গতিধারার জন্ম দেবার যে প্রেরণায় সেদিন ওরা আপ্লুত ছিল আজ তা শুধু মৃত স্মৃতি। যে স্মৃতি প্রেরণা দিতে পারে না, সৃষ্টি করতে পারে না কিছুই, যার শিক্ষণীয় কোন মূল্যই আজ নেই। তা শুধু মৃত স্মৃতি বৈকি। অথচ প্রদীপের মত বন্ধুবৎসল, উদ্যোমী, প্রশান্তের মত দায়িত্ব পরায়ণ, শিবাদের মত সৃষ্টিসুখের উল্লাসী তরুণ সৈনিকদের জন্ম দিয়েছিল সেই সময়, সেই সমাজ। সমাজ আর সময়ের প্রয়োজনেই উদ্যোগী প্রতিভার জন্ম, নূতন প্রজন্মের আগমন। অথচ স্বার্থের প্রয়োজনেই তারা প্রস্থান নেয়, বিভ্রান্ত হয়, হারিয়ে যায়। নিজেকে গুটিয়ে নেয় একে একে। সেই সময় স্মৃতি মহাকালের গর্ভে অবলীলায় হারিয়ে যায় কিন্তু সময় একদিন যাদের জন্ম দেয়, আগমণ ঘটায়, তাদের প্রয়োজন তো শেষ হয়ে যাবার কথা নয়।

আমাদের দূর্ভাগা সমাজ, এই দুঃসময়ে তো তাদের প্রয়োজন দাবী করে। যারা শুধু নিজের যোগ্যতার গুণে নেতা হওয়ার কথা মনে করে তারা নিঃসন্দেহে গোবেট, বিশ্বাসঘাতক, অপরাধীও বটে। যে সন্তান আজ তিল তিল করে শিক্ষিত হচ্ছে বা নেতার স্বীকৃতি অর্জন করছে সে কেবলমাত্র তার মেধা বা অভিভাবকের দেয়া অর্থে শিক্ষার আলো কিংবা নেতার যোগ্যতা অর্জন করে না। পরিপার্শ্বের সমাজ, সময়ই তাকে লালিত করে। শিক্ষা দেয়। দেয় যোগ্যতাও। তাই একজন শিক্ষিত বা যোগ্যতাসম্পন্ন সচেতন লোকের দায়দায়িত্ব কেবল মা-বাপের পালন কিংবা নিজের আখের গোছানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। রবির কথাটি তাই জীবনের বার বার মনে পড়ে। "একজন নেতা কেবল তার স্বীয় গুণেই নেতায় পরিণত হয় না। আমাদের সমাজই তাকে নেতা হিসেবে গড়ে তোলে। এজন্য গোটা সমাজ অসংখ্য উপাদান, মূল্যবান পরিবেশ সৃষ্টি করেই নেতার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তাই একজন নেতার ব্যক্তিগত কিছুই থাকতে পারে না। নেতার সমস্ত কিছুই সমাজের অধীন। তাই সমাজের কাছেই একজন নেতা দায়বদ্ধ।"

অনুরূপ আপাতদৃষ্টিতে যে ছাত্র বা ছাত্রীকে আজ তার অভিভাবক বহুকষ্টে অর্থ যোগান দিয়ে শিক্ষিত করে তুলছে সে যদি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে তবে তা হবে হতাশাব্যঞ্জক। কাজেই আজ যারা স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে তাদের অবশ্যই একা ভুলে গেলে চলবে না যে, জুম্ম জনগণ কঠোর সংগ্রাম করে তাদের শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছে। নিভৃতে, নিঃস্বার্থে কাজ করে যায় আমাদের গোটা সমাজ। চাকরী পাওয়া, ব্যবসা করতে পারা, পড়াশুনা করতে পারা, বিভিন্ন কোটা ভোগ করা, স্কলারশীপ নিয়ে বিদেশ যাওয়া, আন্দোলন করতে পারা ইত্যাদি সবকিছুই লড়াইরত জুম্ম সমাজের অবদান, সংগ্রামের মূল্যে পাওয়া ফল। শত শত মা-বোনের ইজ্জত, হাজার হাজার মানুষের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে যাই হই না কেন আমরা সবাই তাদের কাছে ঋণী যারা পরোক্ষে ভূমিকা রাখে।

আজ অতি আশার কথা যে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন জোরদার হতে চলেছে। শহর থেকে পাহাড়ের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যাচ্ছে আন্দোলনের ঢেউ। আমাদের এ যুগের সূর্য সন্তানরা ঐতিহাসিক গুরু দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে এসেছে অসীম সাহসে। শত শত আত্ম প্রত্যয়ী ছাত্র যুবক বেড়িয়ে এসেছে সরকারী নির্যাতনের ব্যূহ ভেঙ্গে। অগণিত সামরিক স্থাপনার আতংকময় কারাগার ডিঙিয়ে আসছে তারা নির্ভীকভাবে। নিপীড়ক বাংলাদেশ সরকারের সামরিক অসামরিক ব্যবস্থার সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এ সময়ের সাহসী যোদ্ধারা জেল জুলুম, নির্যাতন এমনকি মৃত্যুকেও পরোয়া না করে জুম্ম ছাত্র সমাজ রাজপথে নেমে এসেছে। জুম্ম জনগণের মনে এখন আশার সঞ্চার হয়েছে। হতাশার অন্ধকার মেঘ খসে পড়েছে। এ সবই সময়ের দাবী। সমাজের অবদান। আমাদের অবহেলিত, অত্যাচারিত জুম্ম সমাজের গর্ভে জন্ম নিয়েছে এ নব প্রজন্মের প্রাণতেজোময় সহযোদ্ধারা। সীমাহীন কষ্টে মা যেমন ভ্রুণকে গর্ভে ধারণ করে তিল তিল যন্ত্রণাময় সময় পেড়িয়ে শিশুকে জন্ম দেয় তেমনি আজকে যে তরুণ ছাত্ররা আন্দোলনের ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ যাত্রায় এগুচ্ছে তাদেরও জন্ম দিয়েছে শত সহস্র আশাবাদী মা অর্থাৎ আমাদের সমাজ। কাজেই সমাজের সাথে তারা কখনোই বেঈমানী করতে পারে না। সংকীর্ণ স্বার্থের পংকিল আবর্তে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করার অধিকার তাদের নেই। আমৃত্যু সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদের জন্মের স্বার্থকতা। কিন্তু তেমনটি তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

জীবনরা এযাবৎ অনেককে দেখেছে। সবাই একে একে আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সরে যেতে থাকে। কেউ নীরবে কেউ বা বেঈমানী করে। নইলে শিবা, শিশির, দেব, নির্মল, মংথোয়াই, শক্তিপদ কিংবা পুষ্পের মত প্রতিবাদী বন্ধুরা কেন যুদ্ধে এলো না। প্রশান্তের মত উদ্যোগী বন্ধু কেনই বা সংগঠনে কুঠারাঘাত করে আন্দোলনের স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। এসব আজ ভাবতে গেলে জীবন বেশ ভারাক্রান্ত বোধ করে বৈকি। একদিন সবাই একসাথে কত স্বপ্নই না দেখেছিল। জুম্ম জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের মহান সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে যাবে সবাই। শত শত অসহায় জুম্ম মা-বোনের বীভৎস ধর্ষণের কালিমা ঘুচাতে, সহস্র ভাইয়ের আত্মবলিদানের ঋণ শোধ করতে আজীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে। সানি দা'র লেখাটি বেশ মনে পড়ে। "জুলো দা, শান্তি আর অনিল তঞ্চঙ্গ্যার আত্মবলিদান পাভেলকে যেমন বিপ্লবে টিকে থাকার প্রেরণা যোগায়নি", তেমনি জীবন আর অপ্রিয়দের নিরন্ত র সংগ্রামী কর্মকান্ড অন্য বন্ধুদেরকে আন্দোলনে নিয়ে আসার চেতনা যোগাতে পারেনি। এভাবেই সমীকরণ মিলিয়েছে জীবন এতদিন। তা না হলে সেই সহযোদ্ধা বন্ধুরাও নিশ্চয়ই আন্দোলনের মূল স্রোতধারায় চলে আসত।

১৯৮৬ সালের এপ্রিল-মে মাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমগ্র উত্তরাঞ্চল জুড়ে তখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা জুম্মদের গ্রামে গ্রামে বেপরোয়া আক্রমণ চলছে। খাগড়াছড়ি, দিঘীনালা ও পানছড়ি বিভিন্ন এলাকায় চলছিল ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলা। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে ছারখার করে দেয় সরকারী বাহিনী। এমনকি একটি লোমহর্ষক গণহত্যার অভিযান চলে পানছড়িতে। এতে অনেক নিরীহ মানুষকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। বিভীষিকাময় এই ঘটনায় পালিয়ে যাবার সময় নির্মমভাবে নিহত হন জীবনের বন্ধু ভবেশের বাবা, চরম উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছিল হলে অবস্থানরত জুম্ম ছাত্রছাত্রীরা। সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারী বাঙালী মুসলমানদের এই বর্বরতায় জুম্ম ছাত্রছাত্রী সবাই বিমর্ষ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সেদিন। অনেকের মত ভবেশও শপথ নিয়েছিল - এই নির্মমতার প্রতিশোধ নেয়া চায়। মরণপণ সংগ্রাম করার বুলি আউরিয়েছিল অনেকেই। অথচ ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। পরের ঘটনা আরো মর্মান্তিক। যে সেনাবাহিনীর জল্লাদী হামলার শিকার হয়ে ভবেশের বাবা নিহত হন সেই সেনাবাহিনীর করুণার পাত্র হয়ে ভবেশ পরবর্তীতে চাকরী গ্রহণ করে। পিতার সুযোগ্য সন্তান কিভাবে জন্মদাতার রক্তের সাথে বেঈমানী করে ভাবতে অবাক লাগে। এর চেয়ে বিকৃত ও ধিকৃত ঘটনা আর কি থাকতে পারে জীবন আজো ভেবে পায় না। ১৯৮৯ এর ৪ মে লংগদুর গণহত্যায় "ঢাকা ট্রাইবেল ষ্টুডেন্ট ইউনিয়নের" এককালীন প্রতিবাদী সংগঠক পুতুল্যার মা যখন নিহত হন তখন ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ঢাকায় প্রতিবাদ মিছিলে পর্যন্ত যায়নি পুতুল্যা। প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন প্রশান্ত ত্রিপুরাসহ অন্যান্য ছাত্রবন্ধুরা। তৎকালীন অন্যতম সংগঠক সেই পুতুল্যাও শেষ পর্যন্ত সরকার বা সেনাবাহিনীর উচ্ছিষ্ট চাকরী নামক টোপ গিলে মায়ের মৃত্যুকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে দিব্যি সুখে জীবন কাটাচ্ছে। কি বিচিত্র পৃথিবী। বিচিত্র মানুষের বেহায়াপনা। তাই সুবিধাবাদ, আপোষকামীতা কিংবা দালালীপনা গণহত্যার চাইতেও নির্মম। বেঈমানী আর বিশ্বাসঘাতকতার কি বিচিত্র রূপ। কি নির্মম সেলুকাস!

১৯৮৮ সালের ৮ ও ৯ আগস্ট বাঘাইছড়ি এলাকায় সংঘটিত হয় পর পর অনেকগুলি অত্যাচারের ঘটনা। এসব ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে একটা প্রচারপত্র ছাপানোর উদ্যোগ নেয় হলের জুম্ম ছাত্ররা। প্রচারপত্র ছাপাতে কিছু অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে জুম্ম চাকরীজীবীদের কাছে যেতে হয়। এক চাকুরে যিনি ১৯৮০ সালে সংঘটিত কলমপতি গণহত্যার সময় উদ্বাস্তু হয়ে পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর নিকৃষ্ট করুণায় ভাল চাকুরী পেয়েছিলেন তিনি চাঁদা দেন ২০ টাকা। অথচ তিনি বাঘাইছড়ি ঘটনার দু'দিন পরেই গোটা পরিবার সমেতে ঢাকায় বিমানে চড়ে গেলেন প্রমোদ ভ্রমনে। হাজার টাকা খরচ করে উড়োজাহাজে চড়তে আমাদের সমাজের এই মানুষরা যত গর্বিত, গণহত্যায় নিহত স্বজনদের উদ্দেশ্যে ২০ টাকা সাহায্য করতে ততটা লজ্জিত নয়। এমনকি কত যে জঘন্য অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জীবন আজ সেই সব ঘটনার কথা মনে করে পীড়িত বোধ করে।

১৯৯০ এর ডিসেম্বর মাস। দেশব্যাপী গণ-আন্দোলনের জোয়ার। বাংলাদেশে গোটা ছাত্র সমাজ তখন স্বৈরাচার হঠানোর আন্দোলনে রাজপথে। যতদিন স্বৈরতন্ত্রের পতন হবে না, ততদিন ঘরে না ফেরার ঐতিহাসিক শপথ নিয়ে বাংলার দামাল ছাত্র সমাজ স্বৈরাচারী সকল নিপীড়ন যন্ত্রের সাথে মুখোমুখী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে। দীর্ঘ নয় বছরের স্বৈরাচারী ক্ষমতার গদিতে তখন তাল মাতাল অবস্থা। সুদূর ইউরোপ থেকে "পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন" নামের এক আর্ন্তজাতিক সংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার পরিস্থিতির সরেজমিনে তদন্তে আসে। এই কমিশনকে পার্বত্য এলাকায় সাহায্য করতে জীবন আর অপ্রিয় বিশেষ তৎপর হয়। ঢাকাতে এই কমিশনকে রিসিভ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সফরের সার্বিক পরিকল্পনায় সহযোগিতা দেয়। চট্টগ্রামে এসে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন যখন চট্টগ্রাম সেনানিবাসে জিওসি'র সাথে যোগাযোগ করেছিলেন তখন হোটেল সৈকতে জীবনরা তাদের সাথে দেখা করে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবগত করায়। চট্টগ্রাম শহরে অবস্থানরত জুম্মদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে কমিশনের মিটিং এর আয়োজন করতে চেষ্টা চালানো হয়।

সম্মানিত ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি যাই হোক না কেন মনতোষবাবুই প্রথম এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেন। মনতোষবাবুকে একজন সাচ্চা জাতীয়তাবাদী বলা যায়। তিনি আগ্রাবাদস্থ বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় বসবাসরত জুম্মদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কমিশনের সাথে মিটিং করার জন্য উদ্যোগ নেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হন। স্বার্থ রক্ষার জন্য কেউ সাড়া দেয়নি। চাকরী হারানোর ভয়ে। আর্মীদের কুনজরে পড়ার ভয়ে। দুঃখ করে তিনি বলেছিলেন "তোমরা তো বাবা যুবক, তোমাদের অনেক জীবন বাকি, তোমাদের বেশী রিস্ক নেয়া উচিৎ নয়। রিস্ক নেবো আমরাই যারা আজ বুড়ো হয়ে গেছি। আমরা তো জীবন যৌবন, ভোগ বিলাস সবই দেখেছি। তোমাদেরও সুন্দর অনাগত ভবিষ্যত রয়েছে। তাই তোমাদের আগেই আমাদের মরা উচিৎ। তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদেরই বেশী ত্যাগ করা উচিৎ অনেক কিছু। আগামী প্রজন্মের জন্য পুরাতন প্রজন্মের প্রয়োজনে মৃত্যুর ঝুঁকিও নেয়া উচিৎ।" মনতোষবাবুর এই উৎসাহব্যঞ্জক কথাটি মনে রাখার মতো। আমাদের জুম্ম চাকরীজীবীদের মধ্যে এ রকম বৃদ্ধের সংখ্যা অতি নগণ্য।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে, পরবর্তী পর্যায়ে মনতোষবাবুকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে অন্যায়ভাবে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয় এই বয়োবৃদ্ধ লোকটির উপর। ফ্রান্সের এক মহিলা ও জাপানের এক পুরুষ সাংবাদিককে তখন ফটিকছড়ি হয়ে বর্মাছড়ির গভীর অরণ্যে নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ের নেতার সাথে সাক্ষাৎ করানোর জন্যে। ওরাই শান্তিবাহিনীর জীবন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে ফ্রান্সে ও জাপানে লেখালেখি করে। পরে এই ঘটনার জন্যই মনতোষবাবুকে উর্দিপরা আর্মীরা ধরে নিয়ে যায়। অথচ উনি এর কিছুই জানতেন না। যদিও উনার বাসারই কাছাকাছি ফ্ল্যাট থেকে ঐ সাংবাদিকদের চাকমা ড্রেস পরিয়ে গোপনে নিয়ে যাওয়া হয় গভীর অরণ্যে শান্তিবাহিনীর আস্তানায়। চট্টগ্রাম সেনানিবাসে নির্মমভাবে অত্যাচারের পর যখন তাকে চট্টগ্রাম কারাগারে ডিটেনশন দেওয়া হয় তখনো সদা উদ্যোগী, নিষ্ঠাবান ও অন্যায়ের বিরোধী এ বৃদ্ধ লোকটি নারকীয় যন্ত্রণায় কাতর। পরে জেনেছি উনাকে আঘাত করা হয়নি শরীরের এমন কোন জায়গা নেই। এমন বর্বরোচিত ও পাশবিক অত্যাচার করা হয় সেনানিবাসে।

'৯০ এর গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরচারী এরশাদ সরকারের পতন হলে সারা দেশের মানুষের স্বস্থির নিঃশ্বাস ফিরে আসে। বলতে গেলে মোটামুটি একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সচেতন জনগণও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের একটি ফোরাম গঠন করার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯ ডিসেম্বর '৯০ ঢাকায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে গণধিকৃত পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ বাতিল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের দাবীতে মিছিল ও সভা সমাবেশের পর পরই অনেক জুম্ম ছাত্রবন্ধু চট্টগ্রামে চলে আসে। বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন পেশার জুম্মদের সংগঠিত করার জন্য গণসংযোগ চলতে থাকে। তখন চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী ওতিন দা এবং মনতোষবাবুও সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এই উদ্যোগের ফলেই গঠিত হয় 'পাহাড়ী গণ পরিষদ'। পাহাড়ী গণ পরিষদ গঠনের প্রথম থেকেই আমরা জড়িত ছিলাম। প্রথম প্রথম অনেকেই সাড়া দিয়েছিল। রাঙ্গামাটির মথুরা লাল, বিজয় কেতন, বান্দরবানের হাথোয়াই ত্রি, খাগড়াছড়ির ডাঃ হেমন্ত, চট্টগ্রামে বিক্রমবাবু, বকুলবাবুসহ আরো অনেকেই। অবশেষে ২৪ ডিসেম্বর '৯০ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে গণ পরিষদ ঘোষণা করা হয় তখন ঢাকা থেকে সুবোধবাবুসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পরবর্তীতে গণ পরিষদের অনেক নেতৃবৃন্দের উপর যখন অত্যাচার, গ্রেপ্তার ইত্যাদি শুরু হয় তখন অনেকেই সরে পড়তে থাকেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ওতিনবাবু কৌশলে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকেন। প্রথমে বিজয় কেতন চাকমাকে ষড়যন্ত্র করে রাঙ্গামাটি জেলে আটক করা হয় ডিটেনশনে। পরে মনতোষবাবু ও মংথোয়াই জেলে যায়। অন্যদিকে ঢাকায় সুবোধবাবুকে নানাভাবে হয়রানী করতে থাকে গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা। সাংগঠনিক কার্যক্রমে চরম সংকট দেখা দেয়। ওতিনবাবু তখন প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এক সময় ক্যাডেট কলেজের বন্ধু ডিজিএফআই-এর হোমরা-চোমড়াদের মদের আসরে যাতায়াত শুরু করে দেন তিনি। পুরনো বন্ধুত্ব পূনরুদ্ধার করে গা বাঁচিয়ে চলার আপোষকামী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স-এর এক মেজর মওলার সাথে ওতিনবাবু রীতিমত উঠাবসা করতে থাকেন। সেই মেজর ওতিনবাবুকে প্রায় বলত "পাহাড়ী গণ পরিষদ করে কিছুই হবে না ওতিন। ওসব করে আর্মীদের চটানো ঠিক হবে না।" শেষ পর্যন্ত ওতিনবাবু ভাগ্যান্বেষণে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে চলে যান আমেরিকা। স্ত্রী-পুত্র, পরিজন ছেড়ে এককালে সংগঠক কি যে হয়ে গেল।

১৯৯২-এর এপ্রিল মাস। বাংলা বছরের চৈত্র সংক্রান্তিতে ব্যাপক জুম্মদের মধ্যে আনন্দ উৎসব হয়। শত অভাব অনটন বা দুঃখ দূর্দশার মাঝেও সবখানেই আনন্দের আয়োজন চলে। এই আনন্দ উৎসবে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য ঢাকার বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতৃত্বন্দ, ছাত্র নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মীকে অনুরোধ করা হয়। এতে কিছু চাঁদা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হওয়ায় ঢাকাস্থ জুম্মদের বাসায় বাসায় ধর্ণা দেয়া হয়। ঢাকার সুবোধবাবু এতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখেন। এ উদ্যোগে সবচেয়ে বেশী চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক মারমা ভদ্রলোক। ১১ এপ্রিল 'ডলফিন' কোচে যখন খাগড়াছড়ির উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করছি তখন জাতীয় দৈনিকগুলোতে লোগাং-এ একটা হত্যাকান্ডের প্রকাশিত খবর পেয়ে সবাই আশংকা বোধ করছিলাম উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে না জানি কি হয়।

খাগড়াছড়ি পৌঁছে জানা গেল ১০ এপ্রিল লোগাং এলাকায় সত্যিই একটা রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। শত শত নিরীহ জুম্মকে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর সদস্যরা গুলি করে এবং বহিরাগত বাঙালী মুসলিমরা কুপিয়ে হত্যা করে অনেককে। সকল আনন্দ তখন শোকে পরিণত হয়। ১২ এপ্রিল হাজার হাজার শোকার্ত জুম্ম জনগণের শোক মিছিলের ঢল নেমেছিল খাগড়াছড়ি শহরে। আনন্দের ভাগীদার হতে এসে ঢাকার অতিথিরা শোকের অংশীদার হয়ে শোক মিছিলে সেদিন সামিল হয়েছিলেন। বিকেলে খাগড়াছড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে বিশাল শোকসভার আয়োজন করা হয়। গোটা শোক সমাবেশ কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল সেদিন। বাংলাদেশ সরকার নিরাপত্তা বাহিনীর ঐ পৈশাচিক বর্বরতায় সবাই বিস্মিত বিমর্ষ না হয়ে পারেনি। ঢাকায় ফিরে ১৬ এপ্রিল সুবোধবাবু জার্মানী চলে যান। হামবুর্গে তখন চলছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন। হামবুর্গ থেকে প্যারিস কনসোর্টিয়াম। এভাবে দেশ দেশান্তরে। এ মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে। জুম্ম জনগণের দুঃখ দূর্দশার কথা তুলে ধরতে তিনি পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরেছেন। দেশে আর ফিরতে পারেননি তিনি।

অনেক কিছুই আজ কেবল স্মৃতি। সংগ্রাম আর স্মৃতি যেন একাকার হয়ে থাকে। অতীতের অঙ্গীকারের সাথে বর্তমান ভূমিকার মধ্যে ব্যাপক ব্যাবধান। একই ভাবে মিলবে না হয়তো অনেকের বর্তমানের বক্তব্য ভবিষ্যতের ভূমিকার সাথে। দেশপ্রেম কম বেশী সবার রয়েছে। তবে নিছক দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ কাউকে প্রকৃত সংগ্রামী করতে পারে না। তাই সংগ্রামের আঁকাবাঁকা পথে চলতে চলতে অনেকেই হারিয়ে যায়। অনেকেই হারায় খেই। খেই হারিয়ে যারা চরম বিরোধীতা করে তারাও সুখী হতে পারে না কখনো। তবে একথা সত্য যে নিজের সামাজিক অবস্থানের চরিত্র অনিবার্যভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে আমাদের বিচ্যুত হতে সাহায্য করে। একে একে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই অমোঘ সত্যটি পরিষ্কার জানা ছিল না জীবনের এতদিন। অথচ এই সত্যটিই জানা একান্ত জরুরী। আন্দোলনকারী বা সংগ্রামরত সকল বন্ধুকে এটা অনুধাবন করতে হবে। মানব সমাজের ক্রমবিকাশ জানতে গেলে যেমন সৃষ্টির আদি রহস্য জানতে হয় ঠিক তেমনি সংগ্রামের বিকাশ ঘটাতে চাইলে আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থাও ভালভাবেই জানতে হবে। নচেৎ গোলক ধাঁধাঁয় পড়তে হবে অনিবার্যভাবে। কেবল রাজপথের মিছিল সমাবেশও যথেষ্ট নয়। টিএসসির অডিটোরিয়াম কিংবা জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে ঝাড়া বক্তব্য দিয়েই শেষ নয়। সংগঠনের কিছু দায়িত্বশীল পদ অধিকার করলেই শেষ নয়। চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি নিতেই হবে। খুঁজে নিতে হবে প্রকৃত সংগ্রামের ঠিকানাও। সে সংগ্রাম ইতিহাস বদলানোর। যে সংগ্রামে বিজয় অবশ্যম্ভাবী।

ভুলংতলী মৌনের চারিদিক কুয়াশায় ছেয়ে গেছে। পূর্বাকাশে তখন ভোরের পদধ্বনি। সহযোদ্ধারা যে যার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে। খুব সকাল তৈরী হয়ে নিচ্ছে ওরা। পরবর্তী গন্তব্য ফুরামৌন হয়ে চিম্বুক। চিম্বুক থেকে কেওক্রাডং। জীবনের মনে হয় তার সারা রাত ঘুম হয়নি। হারানোর স্মৃতি আর খুঁজে পাওয়া সংগ্রামের কথা ভাবতেই দুর্গম পাহাড়ীয়া পথ অতিক্রম করতে থাকে জীবনরা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক কথা

গত ১১ মার্চ ২০০৩ রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর সমাপনী বক্তৃতায় সংসদ নেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন যে, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল অত্যন্ত গোপনে। এই চুক্তির মধ্যে সংবিধান বিরোধী অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই চুক্তির বাস্তবায়ন কি হবে তা বর্তমান সরকার জানে না। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান চার দলীয় জোট সরকারের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিএনপি, জামাতে ইসলাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলসমূহ এই চুক্তিকে কালো চুক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং ক্ষমতায় গেলে এই চুক্তি বাতিল করা হবে বলে ঘোষণাও দেয়। কিন্তু বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নীরবতা পালন করতে থাকে। পক্ষান্তরে ক্ষমতায় আহোরণের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে লঙ্ঘন করে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের জন্য পাহাড়ীদের মধ্যে থেকে একজন কেবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ না করে উপমন্ত্রী নিয়োগ করা এবং মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা, পাহাড়ীদের মধ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়োগ না করে বহিরাগত একজন বাঙালী সেটেলারকে নিয়োগ করা ইত্যাদি চুক্তি পরিপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। ফলে জুম্ম জনগণসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হতে থাকে।

এমতাবস্থায় এক পর্যায়ে আইন, সংসদ ও বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মওদুদ আহমদের সাথে গৌতম কুমার চাকমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির এক প্রতিনিধিদলের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে আইন মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ জানান যে, জোট সরকার নীতিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিকে গ্রহণ করেছে। পরবর্তীতে ২০ মে ২০০২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বৈঠক হয়। উক্ত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আশ্বাস প্রদান করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁর সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু এই বৈঠকের পর সরকারের তরফ থেকে কোন ইতিবাচক উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। পক্ষান্তরে বিএনপি'র একটি প্রভাবশালী মহল পার্বত্য চট্টগ্রামে নানাভাবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালাতে থাকে। পরিস্থিতির এমনি টানাপোড়ন অবস্থায় সম্প্রতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদলের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠক শুরু হয়। এই উদ্যোগের ফসল হিসেবে ইতিমধ্যেই গত ৩১ জানুয়ারী, ৮ ফেব্রুয়ারী, ২৬ ফেব্রুয়ারী ও ১২ মার্চ ২০০৩ চারবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকগুলোতে আইন, সংসদ ও বিচার সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ, ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এম শামসুল ইসলাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী মণিস্বপন দেওয়ান এবং বিএনপির হুইপ ওয়াহিদুল আলম উপস্থিত ছিলেন। অপরদিকে গৌতম কুমার চাকমার নেতৃত্বে সুধাসিন্ধু খীসা ও কে এস মং মারমাকে নিয়ে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধিদল আলোচনায় অংশগ্রহণ করে আসছেন।

এই বৈঠকগুলোতে মূলতঃ চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি সমস্যা নিরসনকল্পে চুক্তি মোতাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর সংশোধন পূর্বক ভূমি কমিশনের কাজ শুরু করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি এবং ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ জুম্ম উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স পুনর্গঠন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের আওতাধীন বিষয়সমূহ হস্তান্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের কার্য বিধিমালা চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এই উদ্যোগের ফলে তাৎক্ষণিক কোন ইতিবাচক ইঙ্গিত পাওয়া না গেলেও চুক্তি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকার চাইতে অন্ততঃ আলোচনার একটা ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে এই ভরসায় পার্বত্যবাসীর মধ্যে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, রাষ্ট্রপতি ভাষণের উপর সমাপনী বক্তৃতা দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির উপর যে বিষোদাগার করলেন এবং চুক্তি বাস্তবায়ন কি হবে তিনি স্বয়ং জানেন না বলে যে বক্তব্য দিলেন তাতে পার্বত্যবাসী যারপরনায় হতাশাগ্রস্থ না হয়ে পারে না। যেখানে চুক্তি বাস্তবায়ন ভবিষ্যত কি হবে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জানেন না সেখানে এটা স্পষ্ট যে, বর্তমান সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন সদিচ্ছা বা পরিকল্পনা নেই। বলাবাহুল্য বর্তমান সরকারের উর্ধ্বতন মন্ত্রী মওদুদ আহমেদ, আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, এম শামসুল ইসলাম থেকে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর চুক্তি বাস্তবায়নের যে উদ্যোগ-বৈঠক বা চুক্তি বাস্তবায়নের যে প্রতিশ্রুতি তা নিছক লোক দেখানো বৈ কিছু নয়। ক্ষমতায় আরোহণের পর দুই বছরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে বর্তমান সরকারের রহস্যজনক নীরবতা নিয়ে পার্বত্যবাসী যে আশঙ্কা পোষণ করে আসছে তা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। পার্বত্যবাসী আশঙ্কা পোষণ করে আসছে যে, সম্প্রতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার উদ্যোগে যে আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা মূলতঃ আন্তর্জাতিক জনমতকে প্রশমিত করা, সর্বোপরি প্রথমবারের মতো ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন বাংলাদেশ এইড কনসর্টিয়ামে দাতা সংস্থা ও দেশসমূহের জনমত অনুকূলে আনার লক্ষ্যে একটা আই ওয়াচ বৈ কিছু নয় - এটা সত্যে পরিণত হলো। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রধানমন্ত্রী তথা বর্তমান সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত এহেন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য কখনো মঙ্গলজনক হতে পারে না। সরকারের এটা মনে রাখা দরকার যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা ন্যূনতম সমাধানের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প হতে পারে না। তাই বর্তমান সরকার অধিকতর বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও সাহসী ভূমিকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে এটা জুম্ম জনগণ তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী অধিবাসীদের দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা।

দীঘিনালায় ইউপি নির্বাচনে জুম্মদের উপর সেটেলারদের হামলা

গত ৬ মার্চ ২০০৩ খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে ১নং মেরুং ইউনিয়ন ও ২নং বোয়ালখালী ইউনিয়নের জুম্ম ভোটারদের উপর আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার লেলিয়ে দেয়া সেটেলার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং ভোটকেন্দ্র দখল করে। শাসকদলীয় সন্ত্রাসীদের এ হামলায় বেশ ক'জন আহত হন এবং তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত ব্যক্তিরা হলো -

১। সোনাকাজি চাকমা (২৫) পিতা শান্তি কুমার চাকমা, জয়ন্ত কার্বারী পাড়া। খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
২। চন্দ্র নারায়ণ চাকমা (৭০) পিতা মৃত চন্দ্রনাথ চাকমা, সুশীল হেডম্যান পাড়া। খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
৩। অমর চাকমা (২৪) পিতা চন্দ্র নারায়ণ চাকমা, সুশীল হেডম্যান পাড়া। খাগড়াছড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
৪। মুরতি মোহন চাকমা, পিতা চিগোন চান চাকমা, সুশীল হেডম্যান পাড়া। দীঘিনালা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সেদিন সকাল বেলায় জুম্ম ভোটাররা মেরুং ইউনিয়নের ফুলচান কার্বারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে যথারীতি ভোট দিতে যাচ্ছিল। ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পথে শাসকদলের লেলিয়ে দেয়া সেটেলাররা তাদের উপর সশস্ত্র চড়াও হয়। এ আচমকা আক্রমণে উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিরা মারাত্মকভাবে জখম হয়। অন্যান্য জুম্মরা প্রাণ বাঁচাতে দিকবিদিগ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের পক্ষে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয়া সম্ভব হয়নি। তখন ভোটকেন্দ্রে কেবলমাত্র ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছিল। ইত্যবসরে সশস্ত্র ক্যাডাররা ভোট কেন্দ্রে গিয়ে বুথ দখল করে। প্রিসাইডিং অফিসার, পোলিং অফিসার ও পোলিং এজন্টদের জিম্মি করে যথেচ্ছাভাবে জাল ভোট দিয়ে বাক্স ভরিয়ে দেয়। জুম্মদের উপর আক্রমণের সময় ওয়াদুদ ভূঁইয়ার চামচা প্রবীণ চন্দ্র চাকমা, বর্তমান জেলা পরিষদ সদস্য অনুপম ত্রিপুরা ও হারুন-অর রশিদ ভোট কেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন। ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে তাদের প্রত্যক্ষ মদদে সেটেলাররা প্রকাশ্য জুম্মদের উপর হামলা চালায় এবং বুথ দখল করে যথেচ্ছাভাবে জাল ভোট দেয়।

এদিকে উন্নয়ন বোওর্ডর চেয়ারম্যান ওয়াদুদ ভূঁইয়ার প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য মেরুং ইউনিয়নের উত্তর রেংকার্য্যা কেন্দ্র ও ভূঁইঅছড়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসাররা বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। তম্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভোটদানের সীল না আনা। ফলে পুনরায় উপজেলা সদরে গিয়ে ভোটদানের সীল আনতে গিয়ে ৩ ঘন্টা দেরীতে দুপুর ১২টায় ভোট গ্রহণ শুরু হয় এই দু'টি কেন্দ্রে। একদিকে ভোটদানের সীল উপজেলা সদর থেকে আনতে আনতে দেরী হওয়ার ফলে জুম্ম ভোটারদের ক্লান্ত ও অধৈর্য হওয়া, অপরদিক ফুলচান কার্বারী পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পথে জুম্মদের উপর সেটেলারদের সংঘবদ্ধ হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে নিরাপত্তাহীনতার কারণে অধিকাংশ জুম্ম ভোটার ভোট কেন্দ্র ছেড়ে যার যার গ্রামে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। জুম্ম ভোটারদের সাহস করে যারা ভোট দিতে লাইনে দাঁড়িয়েছিল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সন্ত্রাসীরা তাদেরকে জোরপূর্বক সরিয়ে দিয়ে লাইন দখল করে নেয়। এই সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদ করলে সেনা সদস্য ও ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সন্ত্রাসীরা জুম্মদের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে অপর্ণা সেন কার্বারী (৭৫) এবং বিপুলেশ্বর কার্বারী (৬০) মারাত্মকভাবে জখম হয়। ওয়াদুদ ভূঁইয়া সন্ত্রাসীদের সন্ত্রাসী তৎপরতা, ভোট কারচুপি, প্রিসাইডিং অফিসারদের ভোটদানের সীল না আনা, দেরীতে ভোট গ্রহণ শুরু করা ইত্যাদির প্রতিবাদ করলে প্রিসাইডিং অফিসাররা বলেন যে, তাদের কিছুই করার নেই। তাদের চাকুরী বাঁচাতে হবে। সেজন্য তাদের ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশ পালন করতে বাধ্য হচ্ছে।

এভাবে দীঘিনালা উপজেলার মেরুং ও বোয়ালখালী ইউপি নির্বাচনে ওয়াদুদ ভূঁইয়া সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাদের ছত্রছায়ায় সেটেলারদের লেলিয়ে দিয়ে জুম্ম ভোটারদের উপর আক্রমণ ও মৌলিক অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীদের জেতানোর আপ্রাণ অপচেষ্টা চালায়। ভোট জালিয়াতি ও কারচুপির আশ্রয় নেন। নির্বাচনের আগে তিনি দীঘিনালায় বিভিন্ন জনসভায় মেরুং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী মোছলেহ উদ্দিন ও বোয়ালখালী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী মাসুদ রানার পক্ষে ভোট দিতে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেন। অন্যথায় এই এলাকায় কোন প্রকার উন্নয়ন কাজ হবে না বলে হুমকি দেন। তিনি মেরুং বাজারের সমাবেশে বাঙালি ভোটারদের এও হুমকি দেন যে তার সমর্থিত প্রার্থীকে ভোট না দিলে রেশন কার্ড থেকে নাম কেটে দেয়া হবে এবং পাহাড়ী-বাঙালী নির্বিশেষে কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয়া হবে না। ওয়াদুদ ভূঁইয়া নির্বাচন শুরু হবার আগ থেকে এভাবে নির্বাচনী আচরণ বিধি লংঘন করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও দাঙ্গা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালান।

আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র ক্যাডারদের উল্লেখিত নির্বাচনী সহিংসতার প্রতিবাদে এবং উক্ত দু' ইউনিয়নে পুনঃ নির্বাচনের দাবীতে ৮ মার্চ থেকে ১৬ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত এলাকাবাসী হরতাল পালন করে। শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনকালে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে খাগড়াছড়ি-দীঘিনালা সড়কের ৯ মাইল এলাকায় জুম্মদের উপর পুলিশ ও সেনা সদস্যরা চড়াও হয়। এতে ১৪ জন জুম্মকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের উপর জঘন্য শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। তম্মধ্যে কালাধন চাকমা নামে এক ব্যক্তির হাঁটুতে মারাত্মক জখম হলে গুরুতর অবস্থায় খাগড়াছড়ি থেকে চন্দ্রঘোনা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে আজ অবধি কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ক্ষমতার দাপটে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার এহেন স্বৈরাচারী তৎপরতা, সর্বোপরি সরকারের নীরব ভূমিকার ফলে উক্ত দীঘিনালা এলাকাসহ খাগড়াছড়ি জেলায় চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে শালবন গুচ্ছগ্রামে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থানান্তরিত

উগ্র সাম্প্রদায়িক সেটেলার নেতা আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর এবং অবৈধভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হওয়ার পর ক্ষমতার দাপটে একের পর এক প্রকল্প অন্যান্য এলাকা থেকে সেটেলার অধ্যুষিত এলাকা স্থানান্তর করে নিচ্ছেন অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে। উক্ত পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে পূর্ব সিদ্ধান্তকে বাতিল করে ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে চেঙ্গী ব্রীজের সংলগ্ন স্থান থেকে সেটেলার অধ্যুষিত শালবন এলাকায় খাগড়াছড়ি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট স্থানান্তর করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

খাগড়াছড়িস্থ অব্যবহৃত পাহাড়ী ছাত্রাবাসে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে খাগড়াছড়ি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউটের কার্যক্রম শুরু হয় অনেক আগে। পরে সরকার এই ইনষ্টিটিউটের স্থায়ী ভবন নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এলক্ষ্যে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটি 'জেলা স্থান নির্বাচন কমিটি ও জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটি' গঠন করা হয়। জানা যায় যে, উক্ত ইনষ্টিটিউট স্থাপনকল্পে উক্ত ইনষ্টিটিউটের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক গত ৯ মার্চ ২০০২ তারিখ খাগড়াছড়ির অদূরে শালবনস্থ নন-গেজেটেড ডরমিটরি সন্নিকটে ২.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য সর্বপ্রথম প্রস্তাব দেয়া হয়। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পূর্বতন জেলা প্রশাসক মুজিবুর রহমান হাওলাদার উক্ত কমিটির সভাপতি থাকাকালে ২৩-০৩-২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির সভার কার্যবিবরণী মূলে জানা যায় যে, 'প্রস্তাবিত স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে হলে প্রায় ১.৫০ একর পরিমাণ জায়গার পাহাড় কাটতে হবে। সরকারী টাকায় সরকারী পাহাড় কাটা যথাযথ হবে না। পাহাড় কাটা প্রচলিত সরকারী আইনের পরিপন্থী। প্রস্তাবিত স্থানে পাহাড় কাটা হলে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হবে। তাছাড়া ঘন বসতিপূর্ণ স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা ইনষ্টিটিউট স্থাপন সমীচীন জবে না। অপরদিকে পাহাড় কেটে সমতলকরণের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রচলিত ভূমি ব্যবস্থার আইনেরও পরিপন্থী। এসকল দিক বিবেচনা করে কমিটি প্রস্থাবিত স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন যথাযথ হবে না মর্মে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে কমিটি তাৎক্ষণিকভাবে চেঙ্গী ব্রীজের সন্নিকটে খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম রোড সংলগ্ন একটি স্থান পরিদর্শন করেন এবং স্থানটি প্রকল্পটির জন্য উপযুক্ত বিবেচনায় অগ্রিম অনুমোদন প্রদান করেন।' চেঙ্গী ব্রীজ সংলগ্ন স্থানটির স্বপক্ষে যুক্তি হলো -

১। স্থানটি খোলামেলা ও প্রশস্থ। তাই স্থানটির পরিবেশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুকুল।
২। খাগড়াছড়ি-চট্টগ্রাম এবং খাগড়াছড়ি-রাঙ্গামাটি প্রধান সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক।
৩। আর্মস পুলিশ ব্যাটেলিয়ন ক্যাম্প ও পর্যটন মোটেলের পার্শ্বে অবস্থিত হওয়ায় স্থানটি নিরাপদ।
৪। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত না করে সুপরিকল্পিতভাবে শহরতলী এলাকার বিভিন্ন দিকে সরিয়ে দেয়া - সরকারের এই বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও পরিবেশ নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
৫। এই স্থানে জমির পরিমাণ বেশী (২.২০ একর) এবং অন্যান্য স্থানের তুলনায় ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ ব্যয় অনেক কম।
৬। এই স্থানে পাহাড় কাটার কোন প্রয়োজন পড়ে না।

তৎকালীন জেলা প্রশাসক মুজিবুর রহমান হাওলাদার বদলী হওয়ার পর বর্তমান জেলা প্রশাসক মোঃ হুমায়ুন কবির খান দায়িত্বভার গ্রহণ করলে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া তাঁকে দিয়ে জোর জবরদস্তিমুলকভাবে কমিটির পূর্বতন সিদ্ধান্ত ও জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে চেঙ্গী ব্রীজ সংলগ্ন স্থান থেকে সেটেলার অধ্যুষিত শালবন গুচ্ছগ্রাম সংলগ্ন স্থানে ইনষ্টিটিউটের স্থান নির্বাচন করা হয়। ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অনুগত জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবীর কর্তৃক ইনস্টিটিউটের স্থান পরিবর্তন সম্পর্কিত আহুত সভায় খাগড়াছড়ি পৌর চেয়ারম্যান মংক্যচিং চৌধুরী বলেন যে, শালবন গুচ্ছগ্রামে ইনষ্টিটিউটের স্থান পরিবর্তন অযৌক্তিক। সেখানে ইনষ্টিটিউট স্থানান্তর করা হলে জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে যাওয়া আসা নিরাপদ হবে না। তাছাড়া শালবন একটি ঘনবসতি এলাকা। এই এলাকায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। আর জানা যায় যে, শালবন সংলগ্ন প্রস্তাবিত স্থানটির ভূমি মালিকরা তাদের জমি ছেড়ে দিতে রাজী নন। ইতিমধ্যে ভূমি মালিক অমূল্য রঞ্জন চাকমা (পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা) ও হেমদা রঞ্জন ত্রিপুরা (খাগড়াছড়ি জেলা তথ্য অফিসার) জায়গাটি ছেড়ে দিতে অসম্মতি জানিয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করেছেন। অপরদিকে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউটের ছাত্রছাত্রী, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক ও এলাকাবাসী, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ থেকেও শালবন এলাকায় স্থানান্তরের বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে। তথাপি জেলা প্রশাসক ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশের কারণ দেখিয়ে জনমত, কমিটির সিদ্ধান্ত এবং ছাত্রছাত্রীদের কথা বিবেচনা না করে পূর্বের স্থান বাতিল করে সেটেলার অধ্যুষিত শালবন গুচ্ছগ্রাম এলাকায় ইনষ্টিটিউট এর স্থান নির্বাচন করেছে। বিশেষ করে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার সাম্প্রদায়িক ও একরোখা দৃষ্টিভঙ্গির ফলে প্রশাসন এখনো শালবনে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাতিল করেনি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড বর্তমানে সেটেলার উন্নয়ন বোর্ডে রূপান্তর!

পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ লাভের পর উগ্র সাম্প্রদায়িক ও ক্ষমতাসীন দলের এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডকে কার্যতঃ সেটেলার উন্নয়ন বোর্ডে রূপান্তর করে ফেলেছে। তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে কেবলমাত্র সেটেলার অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোকে কেন্দ্র করেই সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। কেবলমাত্র নতুন উন্নয়ন কার্যক্রম বা নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে নয়, পূর্ব থেকে বাস্তবায়িত হয়ে আসা প্রকল্পগুলিও অর্ধ-সমাপ্ত রেখে জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সেটেলার অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানান্তর করা হচ্ছে। জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সেটেলার অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানান্তরিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে -

১। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৮টি উপজেলায় ইউনিসেফ সাহায্যপুষ্ট সমন্বিত সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পভূক্ত ৮৮টি পাড়া কেন্দ্র, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার ১০টি উপজেলায় ৬৩টি পাড়া কেন্দ্র এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার ৭টি উপজেলায় ৮৪টি পাড়া কেন্দ্র সর্বমোট ২৩৫টি পাড়া কেন্দ্র নানা অজুহাতে বাতিল করে সেটেলার অধ্যুষিত এলাকায় নেয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে পাড়া কর্মী বাছাই এবং নিয়োগের জন্য উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, পাড়া কর্মী বাছাই করবে তাঁর দলীয় লোকেরা। আর কেবলমাত্র নিয়োগ দেবে বোর্ডের কর্মকর্তারা।
২। রাঙ্গামাটি জেলাধীন সাজেক/বরকল এলাকা থেকে কমলা বাগানের প্রকল্প সেটেলার অধ্যুষিত রামগড় ও মানিকছড়ি এলাকায় স্থানান্তরের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। অথচ কমলা বাগানের জন্য উপযুক্ত স্থান হলো একমাত্র রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক এলাকা এবং বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি ও থানছি এলাকা।

সম্প্রতি জানা গেছে যে, ওয়াদুদ ভূঁইয়ার নির্দেশে খাগড়াছড়িস্থ পাহাড়ী ছাত্রাবাসটি এতিমখানায় রূপান্তর করা হচ্ছে। এরশাদের শাসনামলে ১৯৮৪ সালে তিন পার্বত্য জেলা সদরে গরীব ও মেধাবী জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের জন্য কয়েকটি ছাত্রাবাস স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতাসীন হলে উক্ত ছাত্রাবাসগুলো বন্ধ করা হয়। তন্মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলার ছাত্রাবাসটি প্রথমে খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আবাসিক গৃহ, এরপরে সেনাবাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট সন্ত্রাসী মুখোশ বাহিনীর আবাসিক ভবন এবং সর্বশেষ খাগড়াছড়ি টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের অস্থায়ী ভবন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সম্প্রতি এই ছাত্রাবাসের ভবনে আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়া এতিমখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিচ্ছে। এতিমখানার জন্য ষ্টাফ নিয়োগেরও ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। অপরদিকে রামগড় মহকুমা থাকাকালে স্থাপিত কারাগার ভবনটিতেও (বর্তমানে পরিত্যক্ত) ওয়াদুদ ভূঁইয়া তাঁর নামে সেটেলার শিশুদের জন্য একটি এতিমখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করছে বলে জানা যায়। কোন নিয়ম-নীতি তোয়াক্কা না করে সরকারী সম্পত্তির উপর এভাবে এতিমখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে এলাকাবাসীর তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে।

মোট কথা বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের সামগ্রিক উন্নয়ন স্থবির হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে বোর্ডের সকল কার্যক্রম সাম্প্রদায়িকতা ও দলীয়করণের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এমনও অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, বিএনপি নেতা-কর্মী কর্তৃক কোন প্রকল্প জমা পড়লে তা যেন অবশ্যই অনুমোদন করা হয় এমন নির্দেশও রয়েছে উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের উপর। অপরদিকে বোর্ডের অধিকাংশ ঠিকাদারী কাজ কেবলমাত্র ওয়াদুদ ভূঁইয়ার আত্মীয়-স্বজন ও দলীয় নেতা-কর্মী তথা সেটেলারদের মাধ্যমে করা হচ্ছে। প্রতিশোধের ভয়ে বোর্ডের কর্মকর্তারা এখন দেখেও না দেখার ভান করে দিনাতিপাত করছে।

বিএনপি নেতৃত্বাধীন বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আহোরণের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পৃথক পৃথক প্রতিনিধিদলের সাথে আইন, সংসদ ও বিচার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মওদুদ আহমদ, অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান, ভূমি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এম শামসুল রহমানসহ মন্ত্রী পরিষদের সিনিয়র মন্ত্রীবর্গের সাথে বৈঠক অনুষ্ঠান, পরবর্তীতে ২০ মে ২০০২ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার বৈঠক, সর্বোপরি অতি সম্প্রতি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার উদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বৈঠক শুরু হওয়ার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী-বাঙ্গালী স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, একদিকে উপরেল্লেখিত উদ্যোগের ফলে পার্বত্যবাসীর মধ্যে আশার সঞ্চার হলেও পক্ষান্তরে ক্ষমতাসীন দলের এমপি আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়ার অপতৎপরতার ফলে পার্বত্যবাসীর মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি পরিপন্থী কার্যকলাপের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সরকারের সকল ইতিবাচক উদ্যোগ ম্লান হতে বসেছে। তাই দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের অনুকূল পরিবেশ অক্ষুন্ন রাখার প্রয়োজনে অচিরেই উক্ত আবদুল ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের পদ থেকে অপসারণ করা, তাঁর সকল প্রকার সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক অপতৎপরতা বন্ধ করা, জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে সেটেলার অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থানান্তরিত সকল প্রকল্প বাতিল পূর্বক পুনরায় জুম্ম অধ্যুষিত অঞ্চলে বাস্তবায়ন করা জরুরী বলে পার্বত্যবাসী মনে করে।

সেটেলার কর্তৃক বেদখলকৃত জমি বৈধ করার প্রশাসনিক ষড়যন্ত্র চলছে অব্যাহতভাবে

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার অন্যতম মূল সমস্যা হচ্ছে ভূমি সমস্যা। যে সমস্যা জুম্ম জনগণকে আজ নিজ ভূমে পরবাসী এবং বিপন্ন একটি জনগোষ্ঠীতে পরিণত করেছে। মূলতঃ ১৯৭৯-৮০ সালের দিক থেকে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধিকে লঙ্ঘন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমতল জেলাগুলো থেকে হাজার হাজার বাঙালী পরিবার পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি প্রদান করে। পাশাপাশি সামরিক অভিযান চালিয়ে এবং এই সকল সেটেলারদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে হাজার হাজার জুম্ম পরিবারকে স্বভূমি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করা হয়, এমনকি শত শত ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়ে অগণিত জুম্ম পরিবারকে নিজস্ব বাস্তুভিটা ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। এসময় শুধু ঘরবাড়ী নয়, জুম্মদের অনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ধ্বংস করে দেয়া হয়। ফলে হাজার হাজার জুম্ম ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এছাড়া হাজার হাজার পরিবার আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়।

এরই সুযোগে বহিরাগত সেটেলারদের দিয়ে অবৈধভাবে জুম্মদের জায়গা-জমি ও বসতভিটা বেদখল করা হয়, এমনকি প্রচলিত আইনকে লংঘন করে ও যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী জুম্মদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে পদদলিত করে ভূয়া দলিল সৃষ্টি করে জুম্মদের জমি সেটেলারদের নামে বন্দোবস্তী দেয়া হয়। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যা এক জটিলতর আকার ধারণ করে। যে কারণে পার্বত্য সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে এই ভূমি সমস্যা যথাযথভাবে সমাধানের জন্য ভূমি কমিশন গঠন ও এর মাধ্যমে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং ভূমি কমিশন কার্যকর না হওয়ায় পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সমস্যার সমাধান হতে পারছে না, জায়গা-জমির প্রকৃত মালিকরা তাদের জায়গা-জমি ফেরত পাচ্ছে না। ফলে সমস্যার সমাধান না হয়ে তা আরো জটিলতার দিকেই মোড় নিচ্ছে। অনেক আবেদন-নিবেদন করেও জমির প্রকৃত মালিকরা তাদের জমি ফেরৎ পাচ্ছে না কিংবা কর্তৃপক্ষের কোন সন্তোষজনক জবাব পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে প্রশাসন নানা ষড়যন্ত্র করে সেটেলারদের নামে রেকর্ডভূক্ত করার বা অবৈধভাবে বন্দোবস্তীকৃত জমির খাজনা আদায়ের জন্য হেডম্যানদের চাপ দিয়ে চলেছে। নিম্নে এর কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হল।

দীঘিনালায় সেটেলারদের ভূয়া বন্দোবস্তী এবং তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের সরকারী নির্দেশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের যেসব এলাকার জুম্মরা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বহিরাগত সেটেলারদের কর্তৃক ভূমি বেদখলের শিকার হয়েছে এর মধ্যে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাধীন দীঘিনালা উপজেলা অন্যতম। সম্প্রতি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে স্মারক নং তিন-২/২০০২ (খাজনা, করাদির দাবী আদায় নথি)-৩২৯(৬) তারিখ ২৮/৮/২০০২ এবং ২২/৭/২০০২ তারিখের এম.এ-১৩/১-১/২০০২-৭৩৬/(৪০)নং স্মারক(জুন)/২০০২ মাসের রাজস্ব সম্মেলনের কার্যবিবরণী মূলে বহিরাগত সেটেলারদের দ্বারা বৈধ বন্দোবস্তীকৃত জায়গা-জমি থেকে খাজনা আদায়ের জন্য ৩০নং বড় মেরুং মৌজা, ২৯নং ছোট মেরুং মৌজা, ৫৫নং ছোট হাজাছড়া মৌজা, ২৮নং রেংকায্যা মৌজা ও ৫৪নং তারাবনিয়া মৌজার হেডম্যানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের এক ষ্টান্ডিং অর্ডারে এ সকল জলেভাসা জমি একসনা ভিত্তিতে জমির মূল মালিকদের বন্দোবস্তী দেয়ার বিধান করা হয়। এছাড়া ১৯৯৮ সালের ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিধি মোতাবেক কাপ্তাই বাঁধের জলেভাসা জমিগুলো উক্ত ষ্টান্ডিং অর্ডার মোতাবেক বন্দোবস্তী দেয়ার বিধান করা হয়। কিন্তু উক্ত নির্দেশ অমান্য করে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক সেটেলার বাঙালীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

দীঘিনালার সকল হেডম্যান এবং স্থায়ী বাসিন্দার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে পেশকৃত এক পত্রে দীঘিনালায় বহিরাগত সেটেলারদের নামে অবৈধ, ভূয়া বন্দোবস্তী মামলা বাতিল করা এবং তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় বন্ধ করার দাবী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত মৌজার বহিরাগত সেটেলারদের নামে অবৈধ বন্দোবস্তী মামলা রয়েছে এবং এই অবৈধ বন্দোবস্তী মামলা বৈধ করার পাঁয়তারা হিসেবে জেলা প্রশাসন কর্তৃক তাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে হেডম্যানগণের পত্রে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো উল্লেখ করা হয়, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করার সময় বহিরাগত সেটেলাররা মৌজা প্রধানের অজান্তে আইন বহির্ভূতভাবে জালিয়াতি ও দুর্নীতির মাধ্যমে এই ভূমি বা পাহাড় বন্দোবস্তী মামলাগুলো রুজু করে। আর ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি ও জুম্মদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকারকে লংঘন করে মৌজা প্রধানের প্রতিবেদন ব্যতিরেকে ও জুম্মদের রেকর্ডভুক্ত ও ভোগদখলীয় থাকা সত্বেও সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্তৃপক্ষ সেটেলারদের নামে বন্দোবস্তী এবং কবুলিয়ত প্রদান করে। চুক্তির পর জুম্মরা আশা করেছিল যে, প্রকৃত মালিক হিসেবে তারা এই বেদখলকৃত জায়গা-জমি ফেরৎ পাবে। কিন্তু এব্যাপারে কোন পক্ষ থেকে কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত না হওয়ায় দিন দিন এই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করছে।

দীঘিনালার বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের ভূমি এখনো সেটেলারদের দখলে

সম্প্রতি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে দীঘিনালার পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের রেকর্ডীয় ভূমি থেকে বেদখলকারী সকল বহিরাগত সেটেলারদের উচ্ছেদ করা এবং আশ্রমটি অবিলম্বে পুনরায় চালু করার সুযোগ প্রদানের আবেদন জানানো হয়েছে। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০০২ এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেন পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রমের প্রতিনিধি জ্ঞানধ্বজা মহাথেরো এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল। আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়, অত্র এলাকার অনাথ ও দুস্থ ছেলেমেয়েদের জন্য ১৯৬১ সালে দীঘিনালার বোয়ালখালীতে প্রতিষ্ঠা করা হয় এই পার্বত্য চট্টল বৌদ্ধ অনাথ আশ্রম। যার নিবন্ধী নং-চট্ট/৫৮(২৪৪৫)৬৮। বন্দোবস্তীকৃত ৫ (পাঁচ) একর জমিসহ আরো প্রায় তিনশত একর পাহাড় ভূমি এই আশ্রমের দখলীয় ছিল। আশ্রমে ১৯৭৫ সাল অবধি ১ম হতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হয় এবং ১৯৭৬ সাল হতে জুনিয়র স্কুল হিসেবে শুরু হয় এবং ১৯৮২ সাল হতে কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃক নবম শ্রেণী খোলার অনুমোদন দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এই আশ্রমের আনুকূল্যে ১৯৬৬ সাল হতে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়া আরম্ভ হয়।

উক্ত ৩০৫ একর আশ্রমের জমির উপর বৌদ্ধ মন্দির ছাড়াও ছিল পালি কলেজ, অতিথি ভিক্ষু বিশ্রামাগার, অনাথ, শিক্ষক ও ষ্টাফদের আবাসিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, চিকিৎসা কেন্দ্র, বিদ্যালয় ভবন, কারিগরী শিক্ষা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ফলমূল ও গামারী বাগান। বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিল এমপিওভুক্ত। কিন্তু ১৯৮৬ সালের ১৩ জুন বহিরাগত সেটেলাররা দীঘিনালাস্থ বহু গ্রাম ও পাঁচটি বৌদ্ধ মন্দিরসহ এই অনাথ আশ্রমটিরও সবকিছু জ্বালিয়ে দেয় এবং বহু মূল্যবান জিনিসপত্র, গরু-ছাগল ইত্যাদি লুটপাট করা হয়। এসময় আশ্রমে অনাথ ও দুস্থ ছেলেমেয়ে ছিল ৩০০ জন। এদের মধ্যে ২৫০ জন ভারতের শরনার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়, বাকী ৫০ জন আশ্রয় নেয় রাঙামাটির মোনঘর আশ্রমে। পরে আশ্রমটির দখল ফিরে পাবার ব্যাপারে আবেদন করা হলে দীঘিনালা উপজেলা কর্মকর্তা কর্তৃক স্মারক নং ৯৯৫(১৬৭) তারিখ ১৯/০৮/৯৮ মূলে সেটেলার বাঙালীদের অবৈধ দখল ছেড়ে দেবার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিবের বরাবরে আশ্রমের ৩০০ একর ভূমি বন্দোবস্তের যাবতীয় কাগজপত্রাদিও পেশ করা হয়। এছাড়া আশ্রমটি পুনরায় চালু করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পও পেশ করা হয়েছে। কিন্তু সেটেলাররা দখল ছেড়ে না দিয়ে দখল বজায় রাখা বা বন্দোবস্তী করার জন্য নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মদদে সোনামিয়া নামে জনৈক সেটেলার 'পার্বত্য চট্টল অনাথ আশ্রম' এর স্থলে 'অনাথ আশ্রম বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে নাম পরিবর্তন করার আবেদন জানিয়েছে। ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফ থেকে একবার শুনানীও গ্রহণ করা হয়েছে। প্রশাসন ও সেটেলারদের এই নতুন ষড়যন্ত্রের ফলে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ বিরাজ করছে।

খাগড়াছড়ি এপিবিএন ক্যাম্প কর্তৃক বেদখলকৃত জমি ফেরৎ পায়নি প্রকৃত মালিকরা

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের গোলাবাড়ী মৌজা বাসিন্দা বর্তমানে পানখাইয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় টিলা পাড়ায় বসবাসকারী ভূমিহীন ১৮ পরিবার ও পানখাইয়া পাড়ার উদ্বাস্তু পরিবারগুলি খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের বরাবরে তাদের বসতভিটা ৭ম আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন (এপিবিএন), খাগড়াছড়িকে বন্দোবস্ত্রী প্রদান বন্ধসহ এর অনুকূলে সৃজিত বন্দোবস্তী মামলা বাতিল করার দাবী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, খাগড়াছড়ির এই এপিবিএন ক্যাম্প ১৯৮৬ সালে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উক্ত জুম্ম পরিবারগুলিকে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে এবং বাগান-বাগিচা ধ্বংস করে স্থাপন করা হয়। সে সময় এপিবিএন-এর পক্ষ থেকে জুম্ম পরিবারগুলিকে বলা হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি ভালো নয়। শান্তিবাহিনীর সাথে গোলাগুলি হলে ক্যাম্পের আশেপাশে হওয়ায় ক্রশ ফায়ারে পাড়াবাসীরা মারা যাবে। তথাকথিত নিরাপত্তার নামে তাদেরকে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। আরো বলা হয় যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তাদেরকে আবার স্ব স্ব বসতভিটা ফেরত দেয়া হবে এবং বাড়ীঘর করতে পারবে। সেই থেকে এই জুম্ম পরিবারসমূহ সরল বিশ্বাসে পানখাইয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয় টিলায় ও পানখাইয়া পাড়ার যে যার আত্মীয়-স্বজনের আশ্রয়ে অস্থায়ীভাবে অদ্যাবধি বসবাস করে আসছে।

ইতোমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ১৫ মার্চ ২০০১ উক্ত বাস্তুহারা জুম্ম পরিবারসমূহ স্ব স্ব বসতভিটায় বাড়ীঘর নির্মাণের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার করতে গেলে এপিবিএন সদস্যরা বাঁধা দেয়। তবে গোলাবাড়ী মৌজার হেডম্যান অংক্যচিং চৌধুরীর সম্মুখে এপিবিএন কমান্ডার জানান যে, অধিগ্রহণের অতিরিক্ত খাসজমি তাদের দরকার নেই। সরকারী আমিন/কানুনগো দ্বারা সীমানা নির্ধারণ করা হলে জুম্মরা স্ব স্ব জায়গায় বাড়ীঘর করতে পারবে। কিন্তু আজ অবধি এপিবিএন কর্তৃপক্ষ ভূমির সীমানা নির্ধারণ করেনি এবং জুম্মদের বসতভিটা ফেরৎ দেয়নি। পক্ষান্তরে এপিবিএন ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পের নামে বন্দোবস্তী করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে বলে জানা গেছে। বসতভিটা দখল নিতে গেলে এপিবিএন জওয়ানরা মারধর করার হুমকি দিচ্ছে বলে জানা যায়। অপরদিকে অতি গোপনে এপিবিএন কর্তৃপক্ষ জুম্মদের জমিগুলি তাদের অনুকূলে বন্দোবস্তী করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

রাঙ্গামাটিস্থ পার্বত্য বাণিজ্য মেলা ২০০৩ ঃ কিছু প্রশ্ন

গত ১১ মার্চ ২০০৩ রাঙামাটি স্টেডিয়ামে পার্বত্য বাণিজ্য মেলা ২০০৩ শুরু হয় এবং ২৬ মার্চ পরিসমাপ্তি ঘটে। বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী পক্ষ কালব্যাপী ১ম পার্বত্য বাণিজ্য মেলা ২০০৩ উদ্বোধন করেছেন। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতি মন্ত্রী বরকত উল্লাহ ভূলু, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী মনিস্বপন দেওয়ান প্রমুখ। রাঙামাটি জেলা প্রশাসক ড. জাফর আহমেদ খান বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলা প্রশাসন ও তিন পার্বত্য জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির যৌথভাবে এই মেলা আয়োজন করেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অর্থনৈতিক স্পন্দন ফিরে আনার জন্য এই ধরনের মেলার গুরুত্ব রয়েছে নিঃসন্দেহে। বাণিজ্য মন্ত্রীও স্বয়ং এ ব্যাপারে বক্তব্য রেখেছেন। এছাড়া এ অঞ্চলের সাথে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে ব্যবসার পথ সুগম হতে পারেও মন্তব্য করেছেন। সর্বোপরি বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে এই অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনও সরকারে লক্ষ্য বলে তারা বক্তব্যে তুলে ধরেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কতটুকু পার্বত্য অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রাণস্পন্দন ফিরে আনবে এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে পার্বত্যাঞ্চলের দারিদ্র্য ঘুচাতে সহায়ক হবে তাতে সচেতন মহলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কেননা বাণিজ্য মেলা হতে হবে এই অঞ্চলের পণ্যসম্ভার বিকাশ ও বাজারে প্রতিযোগিতায় এখানকার পণ্য যেন টিকতে পারে তার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে।

অনেকে মনে করছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে সরকার এধরনের পদক্ষেপ নিয়েছ। বিশেষ করে বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বিগত সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র চা চাষ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা এবং বাণিজ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে কান কথা বলেননি। সচেতনভাবে এড়িয়ে চলেছেন। তাছাড়াও প্রশাসনিকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদকে উপেক্ষা করে পাশ কাটানো এবং কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা প্রদর্শন না করার কারণে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় জনপ্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহের ভূমিকা এতে মুখ্য হওয়া কাম্য ছিল। কিন্তু আমলারা সকল ধরনের নীতি নির্ধারণে ভূমিকা রেখে তাদের মনগড়াভাবে মেলাকে সাজিয়েছেন। সব মিলিয়ে সরকার ভিন্ন নীতি নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যাকে সমাধান করার উদ্যোগ নিচ্ছে। জিয়াউর রহমানের আমলে অর্থনৈতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড করার মাধ্যমে সমস্যা সুরাহার চেষ্টা চলেছিল। বর্তমানেও বাণিজ্য মেলা করার মাধ্যমে কোন সমাধানের পথে সরকার পার্বত্যবাসীকে নিয়ে যেতে চাইছে তা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে।

সাধারণভাবে বাণিজ্য মেলার মাধ্যমে এ অঞ্চলে উৎপাদিত সকল প্রকার পণ্যের বাজার সৃষ্টি ও কৃষি পণ্যের শিল্পজাত করার সুযোগ ও বাইরের ব্যবসায়ীদের সাথে এখানকার ব্যবসায়ী মহল ও শিল্পপতিদের যোগাযোগ ঘটানোর কথা। কিন্তু মেলা ঘুরে তার কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়নি। এ অঞ্চলের উৎপাদিত কাঠ কিভাবে শিল্পপণ্যে রূপান্তরিত করা যায় বা ফিনিশিং উড কিভাবে দেশীয় বাজারে বিপনন করা যায় তার কোন প্রকার উদ্যোগ নেয়নি। দুর্নীতি পরায়ণ বন আমলা, জেলা প্রশাসন মিলে বহিরাগতদের দ্বারা গজিয়ে উঠা ফার্নিচার ব্যবসাকে রমরমা করা হয়েছে। সুষ্ঠু নীতি থাকলে এখাতে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ কর্মসংস্থান ও উপার্জনের পথ সৃষ্টি করতে পারত। কৃষিজাত পণ্য যেমন অর্থকরী ফসল আনারস, কলা প্রভৃতি কিভাবে সংরক্ষণ ও বাজারে এর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি কিভাবে ঘটবে তা নিয়েও বাণিজ্য মেলার উদ্যোক্তারা ভেবেছেন বলে মনে হয়নি। তারা প্রতিদিন বিকেলে মনোরঞ্জনের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন মাত্র। বাণিজ্য মেলাতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উৎপাদিত পণ্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি। কিন্তু বাইরের উৎপাদিত পণ্যই এখানেই প্রদর্শন ও বিপনন করা হয়েছে। যেমন- চা চাষ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়েছে। কিন্তু জনবিচ্ছিন্নভাবে চা চাষে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপ করে কোন সুফল বয়ে আসবে না। চা চাষের ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা নিয়ে সরকার এগুচ্ছে তা স্পষ্ট নয়। চা চাষের মাধ্যমে চা দাস সৃষ্টি করে ভূমি কব্জা করার হীন কৌশল সরকার নিতে পারে বলে সচেতন মহলের আশংকা।

বাণিজ্য মেলায় বাইরে উৎপাদিত ভোগ্যপণ্য ব্যাপকভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে। সাধারণভাবে এসকল ভোগ্যপণ্য শহরের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় - যা সাধারণ বাজারে পাওয়া যায়। কিন্তু মেলায় তার স্টল দিয়ে আয়োজকরা কি করতে চেয়েছেন তা নিয়ে প্রশ্ন জাগে। এটা যেন বাণিজ্য মেলা থাকেনি। পরিণত হয়েছে সাধারণ ব্যবসার স্থলে। মেলায় শেষ পর্যন্ত এখানকার কোন উৎপাদিত শিল্প পণ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দেশের বাইরের কোন প্রতিষ্ঠানের চুক্তি বা ব্যবসার পথ উন্মোচিত হয়েছে বলে জানা যায়নি। তবে টু পাইস কামানোর জন্য যারা স্টল দিয়েছেন তারা ভোক্তা ও দর্শকদের কাছ থেকে উচ্চ মূল্যে জিনিসপত্র বিক্রয় করে কাচা পয়সা হাতিয়েছেন বলে জানা গেছে।

পার্বত্য ট্রগ্রামের সমস্যার সাথে অর্থনৈতিক সমস্যা জড়িত থাকলেও কেবল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব নয়। এর সমস্যা রাজনৈতিক এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলের বিরাজমান যাবতীয় সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত হতে পারে। সরকারকে এটা উপলব্ধি করতে হবে। অন্যথায় এজাতীয় বাণিজ্য মেলা আয়োজন করে সমস্যাকে জটিল করবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা

তনয় দেওয়ান

ভূমিকা

২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। জাতিসংঘের ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে এই দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। বিশ্বে জাতিসংঘ সদস্যভূক্ত দেশসমূহে এই দিবসটি নতুন হলেও বাংলাদেশের মানুষের জন্য এটি নতুন নয় বরং অতি পুরনো একটি দিন। যে দিনটির সাথে মিশে রয়েছে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের কথা। এই দিনটির সাথে মিশে রয়েছে সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতের রক্ত আর রক্তাক্ত রাজপথ। যে রাজপথ নিজের মায়ের ভাষার মর্যাদার জন্য লাখো মানুষের পদভারে আজও মুখরিত হয়। ২০০০ সালের আগে এই দিনটি বাংলাদেশে শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হয়ে এসেছে। ১৯৫২ সালের এই দিনে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবীতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করা হলে পুলিশের গুলিতে শাহাদাৎ বরণ করেন সালাম বরকতরা। এই দিনটিকে ভাষার জন্য মহান আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রামের দশ ভিন্ন ভাষাভাষি জুম্ম জাতিসমূহের কাছে এই দিনটিও আশার একটি দিন। নিজেদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার একটি দিন।

মাতৃভাষা হলো একটি জাতির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষার অন্যতম বাহন। বিভিন্ন জাতিসমূহের সমতার ভিত্তিতে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য সকল জাতির সকল ভাষার স্বীকৃতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বহু ভাষার বিকাশ ঘটানো। পৃথিবীতে বর্তমানে ৬ হাজারের অধিক ভাষার প্রচলন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ভাষা হুমকির মুখে বা বিলুপ্তির পথে। এসকল ভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে সভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনা। পৃথিবীর জ্ঞানভান্ডার হতে অমূল্য সম্পদকে হারানো। কেননা যোগাযোগ দক্ষতা, ধ্যান-ধারণা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটাতে এই মাতৃভাষার বিকল্প অন্য কিছু নেই।

ভাষা হলো শিক্ষার প্রধান ও প্রথম উপকরণ। মানব সমাজে প্রথমে মৌখিক ভাষার সৃষ্টি হয়। পরে সভ্যতার বিবর্তনে লিখিত ভাষার বিকাশ সাধিত হয়। লিখিত ভাষা পরবর্তীতে মৌখিক ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছে। যে সকল ভাষার লিখিত রূপ বিলুপ্ত হয়েছে সেসব ভাষাও দ্রুত বিলুপ্তির শিকার হয়। তাই শিক্ষার সাথে ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিশেষায়িত শিক্ষা ব্যতীত অন্য সকল শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। প্রাথমিক শিক্ষার বেলায় তো আরও গুরুত্বপূর্ণ। যদিও কোন ভাষাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় এবং কোন ভাষার জ্ঞানভান্ডারও পরিপূর্ণ নয়। তথাপি অন্য কোন ভাষার জ্ঞান অর্জন করতে হলে নিজের ভাষায় রূপান্তর করে তা অর্জন করা সম্ভব। তাই এক ভাষা অন্য ভাষার সংস্পর্শে এসে সমৃদ্ধ হয়। তবে এই সমৃদ্ধ হওয়ার বিষয়টা নির্ভর করে ভাষাটিকে কতটুকু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চর্চা বা লালন পালন করা হচ্ছে তার উপর। যে ভাষা শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় না তার মূল্য ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই শিক্ষার জন্য যেমনি ভাষার দরকার তেমনিভাবে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে একটি ভাষা টিকে থাকতে পারে। তাই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ভাষাকে কতটুকু প্রয়োগ করা হচ্ছে তার উপর সেই ভাষার মর্যাদা ও মূল্য নির্ধারিত হয়।

ভাষা বিষয়টি ক্ষুদ্র মনে হলেও এর বিলুপ্তিকরণে রয়েছে রাজনৈতিক কারসাজি। পাকিস্তানীরা বাঙালি জাতিকে দমিয়ে রাখার জন্য তৎকালীন পাকিস্তানে উর্দু ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। ইংরেজরা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে তাদের কলোনীতে কেরানী তৈরী করেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রেও ভাষার উপর আঘাত হানা হয়েছে। দেখা যায় যে, অনেক আদিবাসী জুম্ম শিক্ষার্থীর নাম বাঙালি শিক্ষক উচ্চারণ করতে পারেন না বলে সেই নাম বাংলাকরণ করেছিলেন। জায়গা ও স্থানের নামের ক্ষেত্রে তো এই কথাটি আরও ব্যাপক। তাই ভাষা নিয়ে প্রতিটি বৃহৎ জাতির আগ্রাসন পৃথিবীতে যুগে যুগে লক্ষ্য করা গেছে।

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সংকট

বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের ঢেউ সকল কিছুকে ছাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাও এই বিশ্বায়নের করালগ্রাস থেকে মুক্ত নয়। পশ্চিমা বিশ্ব ও ইউরোপের ধনাঢ্য দেশগুলোর কর্তৃত্বে ভাষা ও শিক্ষার বিশ্বায়ন ঘটছে। উপনিবেশিক শক্তিগুলো উপনিবেশিক সময়ে উপনিবেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল তাতে সেসকল উপনিবেশিক দেশগুলোর ভাষার গভীর প্রভাব রয়েছে। ফলে উপনিবেশিক শাসনের পতন ঘটলেও এক প্রকার ভাষা সাম্রাজ্য অটুট থেকে যায়। প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধন পশ্চিমা দেশের ভাষার বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। দেখা যায় যে, বৃটিশের উপনিবেশ হিসেবে যেসব দেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে সেসব দেশে ইংরেজী ভাষার প্রভাব অনস্বীকার্য। ভারতীয় উপমহাদেশের বেলায় তা আরও বেশী সত্য। হিন্দি ভাষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তারাও হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করছে। এমনকি কথাটি হিন্দি কিন্তু লিখছে ইংরেজীতে। বিশেষ করে বিনোদনের জগতে এর ব্যবহার অত্যধিক। বাংলাদেশে একটা পর্যায়ে বাংলা ভাষার উপর গুরুত্ব অত্যধিক হারে বাড়ানো হয়েছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এর

ফলে বিশ্বব্যাপী মেধার যে প্রবাহ তাতে বাংলাভাষীরা পিছিয়ে পড়েছে। কথাটির হয়তো যৌক্তিকতা থাকতে পারে কিন্তু তা একমাত্র ও প্রধান কারণ নয়।

বাংলাদেশ সরকারের যতগুলো কার্যবিভাগ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ বিভাগটি হলো শিক্ষা বিভাগ। এই শিক্ষা বিভাগের দুর্নীতি এমন পর্যায়ে যে, এই বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে মানুষ শিক্ষিত হবে তবে শিক্ষা অর্জন করতে পারবে না। এই বাংলাদেশে শিক্ষা হচ্ছে কেরানী বানানোর শিক্ষা, মানুষ বানানোর জন্য নয়। এই শিক্ষা বাস্তবমুখী ও বৈজ্ঞানিক নয় বরং সাম্প্রদায়িক ও অবাস্তব। তাই খোদ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রগতিশীল অংশও মনে করেন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত করে অসাম্প্রদায়িক ও বৈজ্ঞানিক করতে হবে। রোধ করতে হবে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ। শিক্ষা খাতে বাজেটে বরাদ্দ বেশী দেখানো হলেও তা সাধারণ শিক্ষার পেছনে ব্যয় না করে মাদ্রাসা ও ক্যাডেট শিক্ষায় বেশী ব্যয়িত হয়।

মূলতঃ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে বেসরকারীকরণ, পণ্যকরণ তথা সংকোচনের ফলে দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার চরম সংকট চলছে। ঢাকাসহ প্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট ও সন্ত্রাস লেগে রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শাখা বা কারিকুলাম এখানে চালু করে বিত্তশালীদেরকে দেশের মাটিতে বিদেশের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হচ্ছে। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য বেসরকারীকরণের মাধ্যমে বেসরকারী ও বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্ররা চাকুরী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সরকারী ও দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা ছাত্ররা অবহেলার শিকার হচ্ছেন। ফলে এক ধরনের শিক্ষার সংকট সৃষ্টি করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকার শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষাকে গিনিপিগ বানিয়ে ফেলেছে। এতে সুষ্ঠ শিক্ষা নীতিমালা না থাকায় শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, বেকারত্ব ও হতাশার ধুমায়িত স্তুপ সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশে শিক্ষার সর্বোচ্চ রূপের যদি এই হাল তবে প্রাথমিক শিক্ষার কি হাল হবে? প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা হয়েছে। এই অবৈতনিক শিক্ষা বাস্তবজীবনে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এবং কিন্ডারগার্টেনগুলো প্রাথমিক শিক্ষাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ এসকল ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমতালে মান বজায় রাখতে পারছে না।

মাতৃভাষার স্বীকৃতি ও আইনসমূহ

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা নেই। বরং আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনে এর স্বীকৃতি ও সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে যেসকল মানব কল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত জাতিসংঘ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে এই মাতৃভাষাও অন্যতম। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য একে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ১৯৫৭ সালে এ ব্যাপারে আদিবাসী ও উপজাতীয় অধিবাসী কনভেনশন - যা কনভেনশন ১০৭ নামে সমধিক পরিচিত - তাতে স্পষ্টভাবে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকারের কথা ব্যক্ত করেছে। এই কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ২১ ও ২৩-এ এবিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২১-এ রয়েছে যে, 'সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সদস্যের জাতীয় জনসমষ্টির অবশিষ্ট অংশের সাথে সমতার ভিত্তিতে সকল স্তরে শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নিতে হবে।' অনুচ্ছেদ ২৩-এ রয়েছে, '(১) সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর ছেলেমেয়েদেরকে তাদের মাতৃভাষায় পড়তে ও লিখতে শিক্ষাদান করতে হবে, কিংবা যেখানে এটা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে তাদের গ্রুপে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ভাষাতেই সে শিক্ষা প্রদান করতে হবে। (২) মাতৃভাষা বা আদিবাসী ভাষা থেকে জাতীয় ভাষা কিংবা দেশের একটি অফিসিয়াল ভাষায় ক্রমান্বয়ে উত্তরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।' পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান সরকার এতে স্বাক্ষর করেছিল পরে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান এই সনদে স্বাক্ষর প্রদান করেন। কিন্তু বাংলা ভাষার জোয়ারে সমস্ত কিছুকে বিলীন করে দেবার প্রবনতা খোদ শাসকগোষ্ঠী লালন করতো বলে এই সনদের কোন কার্যকারিতা বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হয়নি। তার পাশাপাশি আইএলও এর সিদ্ধান্তটি ছিল নৈতিক দিক বিবেচনা করে। কোন প্রকার প্রশাসনিক উদ্যোগও আইএলও গ্রহণ করেনি।

এরপর আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে যা ১৯৯১ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে বাংলাদেশের জন্য আবশ্যকীয় বলে বলা হয়েছে। এই সনদে অনেকগুলো ধারা রয়েছে এবং এই সনদের ধারা ৩০-এ রয়েছে যে, 'যেসব দেশে জাতি গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় কিংবা ভাষাগত সংখ্যালঘু কিংবা আদিবাসী সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে, সে দেশে ঐ ধরণের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভূক্ত বা আদিবাসী শিশুকে সমাজে তার সম্প্রদায়ের অপরাপর সদস্যের সাথে, তার নিজস্ব সংস্কৃতি ধারণ, নিজস্ব ধর্মের কথা ব্যক্ত করা ও চর্চা করা, কিংবা তার নিজ ভাষা ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

বস্তুত পক্ষে বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী কেবলমাত্র ভাষার অধিকার খর্ব করেনি তারা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহের ব্যাপারেও রাষ্ট্রীয় বিমাতাসুলভ আচরণকে লালন পালন করেছে। একটা বিশেষ ধর্মের ও ভাষার লালন করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় চরিত্রে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে শক্তিশালী করা হয়েছে। যে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক ও স্থায়ী সমাধানের পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর তারিখে সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যেকার সম্পাদিত চুক্তিতে এই

মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের অধিকারকে নতুনভাবে লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য হতে হয়েছে। এই চুক্তির 'খ' খন্ডের ৩৩-এর (খ)-তে লেখা রয়েছে - 'পরিষদের কার্যাবলীর ৩ নম্বরে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সংযোজন করা হইবে ঃ (১) বৃত্তিমুলক শিক্ষা, (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা।' চুক্তির এই ধারাটি ১৯৯৮ সালের পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন (সংশোধিত) আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

উক্ত সকল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইনের সমর্থন ও ভিত্তি থাকা সত্বেও বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের মাতৃভাষা নিয়ে প্রাথমিক স্তরে পড়ালেখা করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যেভাবে বাস্তবায়নে সরকার গড়িমসি ও ক্ষেত্র বিশেষে লংঘন করছে অনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও চরম উদাসীনতা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা

বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা হলো ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বিভিন্ন এনজিও-এর কর্মসূচীর সুবাদে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাবার পূর্বেও ছাত্র/ছাত্রীরা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করছে। মূলতঃ শিশুদের বিদ্যালয়গামী করে উপযোগী করার জন্য এই কর্মসূচীগুলো পরিচালিত হয়। বর্তমানে বাংলা ভাষায় কারিকুলাম রচিত এবং ক্লাশের ভাষা হলো বাংলা। সঙ্গতকারণে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার সাথে কারিকুলাম ও ক্লাশের ভাষা ব্যবহার নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক হয়। কেহ কেহ ক্লাশে মাতৃভাষা ব্যবহার করে বাংলা কারিকুলামকে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা মনে করেন। কিন্তু এটা অসম্পূর্ণ। যেমন উদাহরণ ধরলে বাংলা ভাষায় ডিম আর তা চাকমা ভাষায় হলো 'বদা'। এখন যদি শিক্ষক ক্লাশে চাকমা ভাষা ব্যবহার করে 'বদা' শেখায় তবে ছাত্রটি ক্লাশে নিশ্চিতভাবে বদা (ডিম) পাবে। আবার কেহ কেহ দু'একটি বিষয় মাতৃভাষায় অনুবাদ বা মাতৃভাষায় প্রণয়নকে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার প্রচলন বলে মনে করেন। তাদের সংশয় হলো পুরো বিষয়গুলো মাতৃভাষা হলে শিক্ষার্থীরা অফিসিয়াল ভাষা বাংলার সাথে তাল মেলাতে পারবেন না। তাদের কথায় যুক্তি নেই এটা বলা যাবে না। কিন্তু কথা হলো ক্লাশে একটি বিষয়ে বা দুটি বিষয়ে ইংরেজি শিখিয়ে যেমনি ছাত্ররা ইংরেজী বলতে বা ভাল করে লিখতে পারে না, মাতৃভাষার ক্ষেত্রেও তার অনুরূপ হতে পারে। তাই প্রকৃত অর্থে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ বলতে জুম্ম ছাত্ররা নিজেদের ভাষা শিখবে। এই ভাষা শেখার ব্যাপারটা হবে নিজস্ব বর্ণমালায়। তার সাথে শিখবে বাংলা এবং ইংরেজী। শিশু গবেষকরা মনে করেন একটি শিশু একসাথে ৬টি ভাষা আয়ত্ব করতে পারে। তাছাড়া প্রথম ১০ বছরেই মানব শিশুর মনন জগৎ গড়ে উঠে। পরিণত বয়সে মানুষ যদিও বুঝতে পারে কিন্তু মনে রাখতে পারে না। যা শিশু অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ উল্টো। তাই মাতৃভাষাটা বোঝা মনে না করে বরং বিজ্ঞান, অংক, ভূগোল এধরনের বিষয়গুলো মাতৃভাষায় রচনা করে বাদবাকী বিষয়গুলো বাংলা ও ইংরেজীতে চালু রাখলে শিশুদের শেখার ও জানার সুযোগ অবারিত হতে পারে।

কারিকুলামের বিষয়বস্তু

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কারিকুলামের বিষয়বস্তুতে বিশেষ একটা ধর্মের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংখ্যাগুরু বাঙালি শিশুদের লক্ষ্য রেখে এই কারিকুলাম প্রণীত। মহানবীর আদর্শ পড়াতে গেলে স্বাভাবিকভাবে জুম্ম শিশুটির পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ধর্মীয় বিষয়গুলো প্রধান পাঠ্য বইয়ে এনে শিক্ষার এই আগ্রাসী চরিত্র উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক করে তুলছে। শুধু তাই নয় 'উপজাতি' নামক উপনিবেশিক শব্দটি ব্যবহার করে আদিবাসী জুম্মদের হীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে জুম্ম শিশুরা হীণমন্যতায় ভূগছে। ক্লাশের শিক্ষা তাদেরকে টেনে রাখতে পারছে না। দেশের এই বৈচিত্রপুর্ণ এলাকার জন্য জুম্মদের জীবনযাত্রার উপর ভিত্তি করে কারিকুলাম তৈরী না করলে শিশুদের মনন জগৎ থেকে সাম্প্রদায়িকতা ও হীনমন্যতার বীজ উপড়ে ফেলা যাবে না। তাছাড়া শিশুর শিষ্টাচার বা ভদ্রতা শেখানোর ব্যাপারেও ইসলামী সম্প্রসারণবাদী মানসিকতা রয়েছে। জুম্ম শিশুদের তাদের সমাজ ও পরিবারের পরিপন্থী 'আসসালামু আলাইকুম' বলে নমস্কার দিতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। শিখতে বাধ্য করা হচ্ছে মাতৃভাষা বাংলা বলে। কিন্তু একজন চাকমা ছাত্রের পক্ষে কি মাতৃভাষা বাংলা বলা সম্ভব? তেমনিভাবে মারমা ছাত্রটিও তা বলতে পারবে? এহেন কারিকুলামের পরিবর্তন সাধন না করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার উন্নতি বিধান সত্যি দুরূহ ব্যাপার।

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা প্রসার

পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার সংকট বহু দিনের। সামন্ত নেতৃত্ব প্রথমে শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিল। বৃটিশ আমলে গুটিকয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হলেও সামাজিক অসচেতনতার কারণে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়েনি। দুর্গম পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম কৃষ্ণ কিশোর চাকমা শিক্ষার আলো ছড়াতে স্কুল স্থাপন, সরকারী সাহায্য ও শিক্ষকের বন্দোবস্ত করেন। প্রতিভাবান ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন। তিনি শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদায় আসীন করতে 'কিয়ং' থেকে ছাত্রদের বেরিয়ে আসতে সচেতনতা সৃষ্টি করেন। তার মৃত্যুর পরে ১৯৩৮ সালে বৃটিশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি স্বতন্ত্র বোর্ড গঠন করেন। এসময়ে বোর্ডিং স্কুল নামে ১০টি স্কুল গড়ে উঠে। তবে সেসময়ে শিক্ষার সুযোগ সামন্ত নেতা ও প্রভাবশালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৬৪ সালে কাপ্তাই হ্রদে উদ্বাস্তু হওয়া জুম্মদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পাকিস্তান সরকার অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করে। পাকিস্তান আমলে ৩৯১টি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল, ১১টি উচ্চ বিদ্যালয় ও একটি ইন্টার মিডিয়েট কলেজ গড়ে উঠে। বৃটিশ

আমলের শেষ দিকে জুম্মদের শিক্ষিতের হার ৪% ছিল যা ষাট দশকে এসে ১৯৬৬ সালে ১৮.২% বৃদ্ধি লাভ করে। বাংলাদেশ আমলে এসে এই হার বৃদ্ধি পেলেও গোটা দেশের ন্যায় এ অঞ্চলের শিক্ষার মানও হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট নামে গঠিত তিন জেলায় তিনটি প্রতিষ্ঠান ভাষার ব্যাপারে গবেষণা, পুস্তক প্রকাশ প্রভৃতি কাজ করেছে। তবে এই সকল কার্যক্রম বিশেষ মহল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিধায় উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে।

সম্প্রতি ইউনেস্কোর মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা ও বিশ্বব্যাপী আদিবাসী আন্দোলন জোরদার হওয়ায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর পজিটিভ ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বলা যায় মাতৃভাষা বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। ২০০১ সাল হতে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণের ক্ষেত্রে এনজিওরা কাজ করে যাচ্ছে। ২০০১ সালে নুঅ পহর, জাক, তৃণমূল, টংগ্যা, ফিবেক, রদং, ইমডো, সিআইপিডি, ভাষ আলাম গেইন ঝাঁক ও হিরণমোহন ট্রাইবেল ল্যাংগুয়েজ রিসার্চ সেন্টার এর উদ্যোগে তিনদিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি মাতৃভাষা ঘোষণাপত্র প্রণয়ন এই কার্যক্রমকে জোরদারকরণে ভূমিকা রেখেছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০০২ সালে হিল ট্রাষ্টস এনজিও ফোরাম ও জাক যৌথভাবে এই দিবসটিকে নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করে। সেখানে কয়েকটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়। এবছর ২০০৩ সালে হিল ট্রাষ্টস এনজিও ফোরাম ও কেয়ার বাংলাদেশ এবিষয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করে মাতৃভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসন ও সরকারের উপর চাপ দিয়ে চলেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

বাংলাদেশে এহেন শিক্ষাব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রামে উচ্চ শিক্ষা থেকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা বিপর্যস্ত ও নাজুক। কিন্ডারগার্টেন স্কুল করে অনেকে নিজেদের শিশুদের ভবিষ্যত বাবু বানানোর প্রতিযোগিতায় মেতেছে। শিক্ষক সমাজের একটা অংশ তাদের চাকুরী বর্গা দিয়ে নানাভাবে স্বার্থ আদায় করছেন। আবার অনেকেই নিজেদের বাড়ীর বৈঠকখানাগুলোকে গুরুশালায় পরিণত করে টিউশনি করছে। সুযোগ বুঝে দুর্নীতি পরায়ণ আমলারা শিক্ষকদের কাছ থেকে বখরা নিচ্ছেন। কে কার কাছে দায়বদ্ধ তার কোন হদিস নেই। কেউ দিতে পারে না।

তিন পার্বত্য জেলায় সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো হলো প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান স্থান। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী এলাকা। চাষযোগ্য ধান্যজমি অত্যন্ত কম থাকায় পাহাড়ে চাষ করেও জুমচাষীরা গোটা বছরের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। ঘরের বৃদ্ধ ও শিশুরা শ্রম দিতে বাধ্য হয় বেঁচে থাকার তাগিদে। আর স্কুল যদি হয় অনেক দুরের পথ তাহলে শিশুটির আর স্কুলে যাবার পরিবেশ থাকে না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষা নীতিমালা অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হয়ে আসছে। কমপক্ষে ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক দেওয়ার বিধান এই নিয়মে রয়েছে। ভৌগলিক কারণে সব স্কুলে এক ক্লাশে ৪০ জন করে ছাত্র পাওয়া মুশকিল। এতে স্কুল থাকলেও পর্যাপ্ত শিক্ষক থাকে না। শিক্ষক থাকলেও অনেক সময় উক্ত শিক্ষক এলাকার অর্ধ-শিক্ষিত লোকের কাছে বর্গা দিয়ে শহরে বাস করেন। এতে ছাত্ররা না পায় সুষ্ঠু শিক্ষা না পায় শিক্ষার পরিবেশ।

গত এক দশকে তিন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে এটি জেলা পরিষদগুলো দেখাশুনা করে। রাঙামাটি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মানিকলাল দেওয়ান 'পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষা সংকট ঃ উত্তরণে করণীয়' সেমিনারে জানান যে, 'পার্বত্য জেলা পরিষদের ৪২% অর্থ শিক্ষা ও ধর্মীয় খাতে ব্যয় করা হয়'। কিন্তু দলীয়করণ ও অযোগ্য ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালন করায় শিক্ষার বিদ্যমান এই সংকট দূরীকরণে কোন কার্যকরী ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ স্কুল ভবন নির্মাণ করলেও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার শিক্ষকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন। আবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগুলো জেলা পরিষদের অধীনস্থ কর্মকর্তা নন। তাই তাদের উপর প্রশাসনিক কর্তৃত্ব জেলা পরিষদের উপর থাকে না। আবার রাজনৈতিক যোগ্যতাও না থাকায় কিংবা সদিচ্ছা না থাকায় তারাও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে আগ্রহী হন না। নেতৃত্ব ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার অভাবের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা বেহাল অবস্থায় রয়েছে।

এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, জুম্ম শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে আছে যাদের জীবনে কখনো বাংলা ভাষার সাথে পরিচয় ঘটেনি বা যারা কখনো বাঙালি দেখেনি। আর্মীরা বাঙালি বলে বাঙালিদের প্রতি একধরনের ভীতিও তাদের মনে কাজ করে। তাই স্কুলে গেলে বাংলা ভাষায় কথা বলতে হয়, শিখতে হয় ভেবে তাদের মনে যে সংকোচ ও সংশয় সৃষ্টি হয় তাতেও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সার্বজনীন হতে পারছে না। তাছাড়া বিগত সংঘাতময় পরিস্থিতির সুযোগে সেনাবাহিনী প্রশাসনের সহযোগিতায় জুম্ম অধ্যুষিত এলাকা থেকে সেটেলার অধ্যুষিত এলাকায় অনেক বিদ্যালয় স্থানান্তর করেছে এবং শিক্ষকদের উপরও নিপীড়ন চালিয়েছে। তাই বলা যায় একজন জুম্ম শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় উপযোগী করার মতো যথেষ্ট পদক্ষেপের অনুপস্থিতি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডও শিক্ষা খাতে কাজ করে থাকে। তবে তা খুবই নগন্য। ১৯৯২-৩২ অর্থ বছরে তাদের শিক্ষা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৪%। (সূত্রঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রকাশনা)। ইউনিসেফ এর অর্থ সহায়তায় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড শিক্ষা খাতে কাজ করে চলেছে।

নিম্নে রাঙামাটি জেলার দুটি সারণী উদ্ধৃত করা হলো ঃ

সারণী-১ (রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় স্কুল ও জাতিগত ছাত্র সংখ্যা)

থানার নাম	সরকারী প্রাথমিক	শুধু জুম্ম শিশু পড়ে এমন স্কুল	জুম্ম শিশু প্রধান মিশ্র স্কুল	শুধু বাঙালি শিশু পড়ে এমন স্কুল	বাঙালি শিশু প্রধান মিশ্র স্কুল	প্রায় সমান শিশু পড়ে এমন স্কুল
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
সদর	৫১	৩১	৩	১	১১	৩
কাপ্তাই	৩৯	১৯	৫	৪	১০	১
জুরাছড়ি	২৫	২৩	২	-	-	-
বিলাইছড়ি	১৮	১২	৩	-	২	৩
রাজস্থলী	১৯	১১	৩	-	২	৩
বাঘাইছড়ি	৫২	৩৪	৬	৪	৬	২
কাউখালী	৩	১৭	৭	১	৮	২
লংগদু	৩৯	১৩	-	১৭	৯	-
বরকল	৬৫	৫৪	-	৫	৩	৩
নানিয়ারচর	৪৮	৪৩	-	২	২	১

উৎসঃ ১৯৯৯ সালের থানা শিক্ষা অফিস কর্তৃক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে প্রেরিত মাসিক রিপোর্ট।

সারণী-২ (জাতিগত শিক্ষকের সংখ্যা- রাঙামাটি পার্বত্য জেলা)

জাতিগত পরিচয়	শিক্ষকের সংখ্যা	জাতিগত পরিচয়	শিক্ষকের সংখ্যা	সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা
চাকমা	৫৭৪	লুসাই	২	
মারমা	৭৮	পাংখো	২	১১৬৫
তঞ্চঙ্গ্যা	২০	আসাম	১	
ত্রিপুরা	১২	খিয়াং	১	
বাঙালি	৪৭৫			

উৎস ঃ ১৯৯৯ সালের থানা শিক্ষা অফিস কর্তৃক জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয়ে প্রেরিত মাসিক রিপোর্ট।

কেন মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলা ভাষার সাথে জুম্মদের ভাষার যেমনি পার্থক্য রয়েছে তেমনি রয়েছে জাতিগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যও। ক্লাশে আমার মাতৃভাষা 'বাংলা' বাঙালি ছাত্রের জন্য হলেও জুম্ম ছাত্রের জন্য হতে পারে না। ক্লাশে যখন মহানবীর আদর্শ পড়ানো হয় তখন জুম্ম ছাত্রটি খেয় হারিয়ে ফেলে। ঈদের চাঁদ দেখে জুম্ম শিশুরা খুশী না হয়ে তারা পূর্ণিমা চাঁদকেই ভালবাসে। রমজান বন্ধের চাইতে জুমে ধান পাকার সময়ে জুম্ম ছাত্রটির বেশী বন্ধের প্রয়োজন। আগডুম বাগডুম এর অর্থ শুধুমাত্র তাবৎ জুম্ম শিশুকুলের জন্য দুর্বোধ্য নহে উচ্চ শিক্ষিত জুম্মও বুঝতে পারেন না। তাই কেহ কেহ মনে করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ভাষার সাথে বাংলা ভাষার যে পার্থক্য রয়েছে তাতে আদিবাসী ছাত্রদের পক্ষে বাংলায় শেখা ও বুঝা সম্ভব হয় না। তাই শিশুরা স্কুলের পরিবেশে শেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং স্কুল থেকে ঝড়ে পড়ছে। বিজাতীয় ভাষায় শিখতে গিয়ে একটা ভীতি এবং আশংকা তাদের মনের গভীরে রেখাপাত করে। ফলে একটি আদিবাসী শিশুর মেধা মননের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটছে না। তাই আদিবাসীদের স্ব স্ব ভাষায় প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার পরিবেশ দিতে হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভাষাসমূহ

পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী এগারটি জুম্ম জাতি দশটি ভিন্ন ভাষায় তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে। এসকল ভাষার বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা কখনো তাদেরকে ভিন্নতার দিকে ঠেলে দেয়নি। বরং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করেছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে পার্বত্য চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে চাকমা ভাষা এবং দক্ষিণাঞ্চলে মারমা ভাষা Lingua-Franco হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া পাহাড়ীদের নিজস্ব ভাষার টানের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়ে স্বতন্ত্র অপভ্রংশ বাংলা ভাষাও আন্তঃজাতির মধ্যেকার ভাববিনিময়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ভাষা পরিবার	ভাষা
অ) [illegible]	১। চাকমা ২। তঞ্চঙ্গ্যা
আ) [illegible]	
ক) [illegible]	১। মারমা
খ) [illegible]	১। ত্রিপুরা
গ) কুকি-চীন [illegible]	১। লুসাই ২। পাংখো ৩। বম ৪। খিয়াং ৫। খুমী ৬। ম্রো ৭। চাক

উক্ত ভাষাগুলোর নিজস্ব বর্ণমালা বা হরফও রয়েছে। কোন কোনটি কম্পিউটারের ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে। চাকমা এবং তঞ্চঙ্গ্যারা একই বর্ণমালা ব্যবহার করেন। সচরাচর তাদের ব্যবহৃত বর্ণমালাগুলো চাকমা বর্ণমালা নামে পরিচিত। এই বর্ণমালাগুলো বিষয়ে ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসক বৈদ্য ও শিক্ষিত চাকমাদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ থাকলেও তা একপ্রকার দূর হয়েছে। মারমা এবং চাক জাতির বর্ণমালাও একই। যা মারমা বর্ণমালা হিসেবে স্বীকৃত। বম, লুসাই ও পাংখোরা তাদের ভাষার উপযোগী করে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার করেন। ম্রো এবং খুমীদের ব্যবহৃত বর্ণমালা হলো 'ম্রো চাহ চা'। ত্রিপুরারা বাংলা ও রোমাণ বর্ণ ব্যবহার বিষয়ে এখনো চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদিও রোমান বর্ণমালা শিক্ষিত ত্রিপুরারা ব্যবহার করছেন।

কেয়ার বাংলাদেশের এক জরিপে দেখা গেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে কোথাও পাঁচ ভাষাভাষী স্কুল নেই। দুই থেকে তিন ভাষী স্কুলের সংখ্যা শহরাঞ্চল ও বাজার এলাকায় লক্ষ্যণীয়। অর্ধেক স্কুলই এক ভাষী স্কুল। এই সকল একভাষী স্কুলে ক্লাশরুমে মাতৃভাষা প্রয়োগ করে অন্তত পক্ষে ড্রপ আউটের হার কমেছে বলে তারা মনে করেন।

দীর্ঘমেয়াদী ও বাস্তবমুখী রূপরেখা

একটা ভাষার সাথে সংশ্লিষ্ট জাতির আবেগ ও ভালবাসা জড়িয়ে থাকে। জুম্মদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। নিজেদের ভাষার কথা বলার যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ তা অন্য কোন ভাষায় অর্জন করা সম্ভব নয়। দীর্ঘদিনের অবহেলিত ও বিলুপ্তপ্রায় এই সকল ভাষাগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক মূল্য দেয়া এত সহজ ব্যাপার বা সাদামাটা বিষয় নয়। এই জন্য দরকার একটি বোর্ড। আমরা দেখি যে, বৃটিশ আমলে এ ধরনের একটি শিক্ষা বোর্ড পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য গঠন করা হয়েছিল। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাকেও পার্বত্য জেলা পরিষদের হস্তান্তরিত বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। তাহলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে একটি শিক্ষা বোর্ড গঠন করে সেই বোর্ডের অধীনে মাতৃভাষা প্রয়োগের পদক্ষেপ নিতে হবে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ-এর সমন্বয়ে একটি মনিটরিং সেলও থাকতে হবে। শুধু তাই নয় এই বোর্ডের কাজের সাথে সঙ্গতি রেখে গবেষণা প্রতিষ্ঠানও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চালু রাখতে হবে। যদি সম্ভব হয় সংশ্লিষ্ট জাতির বিশেষ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের নিয়ে স্ব স্ব ভাষা বিষয়ে পর্যবেক্ষণ কমিটি রাখতে হবে। অনেকে আবার এই প্রস্তাবটিও করতে চান যে, আমাদের জুম্মদের মধ্যে অনেকে জুম্মদের ২ থেকে ৩টি ভাষা বলতে পারেন। এখন যদি স্ব স্ব বর্ণমালা ব্যবহার করা হয় তবে একজন মারমা চাকমা কথা বলতে পারলেও চাকমা বই পড়তে পারবেন না। তাই স্ব স্ব বর্ণমালা বর্জন করে রোমান বর্ণমালা ব্যবহার এই সমস্যার সমাধান হতে পারে। বস্তুত পক্ষে যা করা হোক না কেন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে।

এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথমেই প্রতিটি পার্বত্য জেলা পরিষদের অধীনে একটি করে গবেষণা বিভাগ গঠন করা। এতে সংশ্লিষ্ট ভাষার অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা থাকবেন। শুধু তাই নয়, সংশ্লিষ্ট জেলায় বসবাসকারী প্রধান প্রধান জাতিগুলির দায়িত্বও তারা নেবেন। তবে অহেতুক আমলাদের প্রতিনিধিত্ব বাদ দিতে হবে। এই গবেষণা বিভাগ বর্ণমালা, স্কুলসমূহ পর্যবেক্ষণ, বইয়ের পান্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করবে। গবেষণা বিভাগের কাজের জন্য সর্বোচ্চ দু'বছর সময় দেয়া দরকার। তারপর পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তত্ত্বাবধানে একটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা। এতে গবেষণা বিভাগের প্রধান ব্যক্তিগণসহ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধিরা থাকবেন। এই বোর্ড পান্ডুলিপি অনুযায়ী বই ছাপানো এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করবে। এজন্য প্রথমে ১টি বিষয় বা একটি শ্রেণীতে মাতৃভাষা চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। সে সময়ের মধ্যে পরবর্তী শ্রেণীর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। এভাবে পর পর ৫ম শ্রেনী পর্যন্ত চালু করার পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়টি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত একটি বিষয়। তাই মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পার্বত্য জেলা পরিষদের উপর বর্তায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার জন্য তিন পার্বত্য জেলা পরিষদকে যেমনি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে তেমনি উদ্যোগ সফল করার জন্য পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমও গ্রহণ করতে হবে।

মাতৃভাষায় শ্রেণী অনুযায়ী রূপরেখা

শ্রেণী	বিষয়	মাধ্যম	বর্ণমালা	পাঠের বিষয়	ধরন	মন্তব্য
১ম	১। মাতৃভাষা	মাতৃভাষা	নিজস্ব	পা:চ:ভিত্তিক।		সম্পূর্ণভাবে রচনা করা।
	২। গণিত	মাতৃভাষা	বাংলা	প্রচলিত		
	৩। বাংলা	বাংলা	বাংলা	প্রচলিত		ধর্মীয় বিষয়াদি বাদ যাবে।
	৪। চারুকারু ও শরীর চর্চা	বাংলা	বাংলা	-	-	প্রচলিত।
২য়	১। মাতৃভাষা	মাতৃভাষা	নিজস্ব	ঐ		
	২। ইংরেজী	মাতৃভাষা	রোমান	ঐ		
	৩। গণিত	মাতৃভাষা	বাংলা	প্রচলিত		
	৪। বাংলা	বাংলা	বাংলা	প্রচলিত	-	ধর্মীয় বিষয়াদি বাদ যাবে।
	৫। চারুকারু ও শরীরচর্চা	বাংলা	বাংলা	-	-	প্রচলিত।
৩য়	১। মাতৃভাষা	মাতৃভাষা	নিজস্ব	পা:চ:ভিত্তিক।		সম্পূর্ণভাবে রচনা করা
	২। পরিবেশ পরিচিতি	মাতৃভাষা	নিজস্ব		অনুবাদ করা	আপত্তিজনক অংশ সংশোধন করা
	৩। গণিত	মাতৃভাষা	বাংলা	প্রচলিত		
	৪। বাংলা	বাংলা	বাংলা	প্রচলিত	-	ধর্মীয় বিষয় বাদ যাবে।
	৫। চারুকারু ও শরীরচর্চা	বাংলা	বাংলা	-	-	প্রচলিত।
	৬। ইংরেজী	ইং/মা	রোমান	প্রচলিত	-	
৪র্থ	১। মাতৃভাষা	মাতৃভাষা	নিজস্ব	পা:চ: ভিত্তিক।		
	২। পরিবেশ পরিচিতি	মাতৃভাষা	নিজস্ব		অনুবাদ করা	
	৩। গণিত	মাতৃভাষা	বাংলা	প্রচলিত		
	৪। বাংলা	বাংলা	বাংলা	প্রচলিত	-	ধর্মীয় বিষয় বাদ।
	৫। চারুকারু ও শরীরচর্চা	বাংলা	বাংলা	-	-	প্রচলিত।
	৬। ইংরেজী	ইং/ মা	রোমান	প্রচলিত	-	-
৫ম	১। মাতৃভাষা	মাতৃভাষা	নিজস্ব	পা:চ:ভিত্তিক।		
	২। পরিবেশ পরিচিতি	মাতৃভাষা	নিজস্ব	-	অনুবাদ করা।	
	৩। গণিত	মাতৃভাষা	বাংলা	প্রচলিত	-	
	৪। বাংলা	বাংলা	বাংলা	প্রচলিত।	-	ধর্মীয় বিষয় বাদ।
	৫। চারুকারু ও শরীরচর্চা	বাংলা	বাংলা	-	-	ঐ
	৬। ইংরেজী	ইং/মা	রোমান	প্রচলিত	-	

নির্দেশিকা: ইং=ইংরেজী; মা=মাতৃভাষা; বাং=বাংলা; পা:চ:=পার্বত্য চট্টগ্রাম।

শিক্ষক, শ্রেণী কক্ষের সমস্যা ও নিরসন

শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকদেরও নানান সমস্যা রয়েছে। শিক্ষকদেরকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় লিখতে সমর্থ করার জন্য প্রশিক্ষণ দিতে হবে। যারা শেখাবেন তাদেরকে যেন আগেভাগে শিক্ষিত করা হয় সেদিকটির নজর আবশ্যকীয়। এখানে আরও একটি কথা বলে রাখা ভাল যে, জুম্ম ছাত্রদের জন্য মাতৃভাষা বিষয়টি অতিরিক্ত হিসেবে যুক্ত হলে তাতে ক্লাশে নম্বর বৃদ্ধি পাবে। তাই বাংলা ভাষী ছাত্রদের সাথে নম্বর বন্টনে সমস্যা দেখা দিবে। এর সমাধান হিসেবে বাংলা ভাষী ছাত্রদেরকে সংশ্লিষ্ট স্কুলে চালু জুম্মদের যে কোন একটি ভাষা অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পড়তে হবে। এতে সাধারণভাবে বাংলাভাষীদের জুম্মদের প্রতি যে বিদ্বেষ ও নীচচক্ষে দেখার মানসিকতা রয়েছে তাও নিরসন হবে। শুধু তাই নয় জুম্মদের সম্পর্কে সঠিকভাবে জানারও সুযোগ পাবে। ফলে জুম্ম ভাষাভাষীদের সাথে বাংলা ভাষা ভাষীদের ভাষাগত দুরত্ব এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে একটি সুযোগ সৃষ্টি হবে। তবে যেখানে কেবলমাত্র বাংলা ভাষী ছাত্র থাকবেন সেক্ষেত্রে এর কোন দরকার পড়বে না। এছাড়াও আরও বাস্তব সমস্যা উপস্থিত হবে। যেমন - পরিবেশ পরিচিতি বা গণিত প্রভৃতি জুম্মদের মাতৃভাষায় চালু হলে তাতে যদি বাংলা ভাষী ছাত্র থাকেন তাতে কি হবে? এমনকি মারমা প্রধান স্কুলে কয়েকজন চাকমা ভাষী ছাত্র থাকলেও তাদের কি হবে? এ অবস্থায় প্রতিটি ভাষার জন্য এবং প্রতিটি ক্লাশের জন্য শিক্ষক বরাদ্দ দেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তবে এক্ষেত্রে প্রতি ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক এই বিধান না করে তা শিথিল করে কমপক্ষে ২০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক বরাদ্দ দিতে হবে।

তাছাড়াও অধিকতর সংখ্যালঘু জুম্ম জাতিদের বেলায় তা বিশেষ বিবেচনা করতে হবে। যা হোক সমস্যাটির গুরুত্ব হেলাফেলার নয়। অবশ্য আশার কথা যে, একভাষী এবং দুইভাষী বিদ্যালয়ের সংখ্যাই সর্বাধিক। এখানে আরও একটি বিষয় যত্নের সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, স্থানীয় এবং সংশ্লিষ্ট জাতির শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ বা বদলীর সুযোগ পান। এই বিষয়টি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় অধিকতর পশ্চাদপদদের জন্য শিথিল করে ক্রমান্বয়ে উত্তরণ ঘটাতে হবে।

দায়িত্ব কার?

সাধারণভাবে পারিবারিক পরিমন্ডলে ব্যবহৃত ভাষাই শিশু আয়ত্ব করে। এর সাথে তার পারিপার্শ্বিক ভাষাও সে আয়ত্ব করার সুযোগ পায়। তাই পরিবার হলো মাতৃভাষা শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উৎস। শহরাঞ্চলে কিছু কিছু আদিবাসী জুম্ম পরিবার নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার না করে ভদ্র (?) সাজার জন্য বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। এসব ভদ্র (!) পরিবারগুলো বাংলা ব্যবহার করেই নিজেদের মাতৃভাষাকে আড়াল করেন। কিন্তু কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না। মাইকেল মধুসুদন দত্তও নিজের মাতৃভাষা ভুলে থাকতে পারেননি। এইসব তথাকথিত ভদ্র জুম্ম পরিবারগুলোর এই কথাগুলো মনে রাখা উচিত। আবার একথাও সত্য যে, কেবল মাত্র পরিবার কিংবা সামাজিক পরিমন্ডলে মাতৃভাষা ব্যবহার করে সেটাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে এর স্বীকৃতি থাকতে হবে। কোন ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক অথবা ব্যবহারিক মূল্য সৃষ্টি না হলে সে ভাষা অবক্ষয় ও বিলুপ্তির পথে ধাবিত হতে বাধ্য। যে কথাটি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ভাষার বেলায় প্রযোজ্য। তাই কেবলমাত্র পারিবারিক জীবনে মাতৃভাষার ব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার বা রাষ্ট্রের ভূমিকাকে অস্বীকার করলে চলবে না। কিন্তু আমাদের সরকার ও সরকারের স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় যারা রয়েছেন তারা কি এব্যাপারে কিছু ভাবছেন?

মাতৃভাষা চালুকরণ ও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে অবশ্যই এনজিওরা এগিয়ে এসেছেন। এখনো কাজ করছেন। কিন্তু তারাও উপলব্দি করছেন যে, গোটা প্রক্রিয়ায় সরকারের ভূমিকা না থাকলে তা কার্যকর করা সম্ভবপর নয়। অথচ সরকার ও তার প্রতিনিধিরা মাতৃভাষা চালুর ব্যাপারে এনজিওদের পেছনে পড়ে রয়েছে বলা যায়।

উপসংহার

প্রতিটি মানুষের ভালবাসার ও আবেগের সাথে জড়িত রয়েছে ভাষা। মানুষ যখন চিন্তা করে কিংবা স্বপ্ন দেখে তখন সে নিজের ভাষাতেই দেখে। কালের বিবর্তনে জাতিসমূহের অসম বিকাশের কারণে ভাষার ক্ষেত্রে যে সংকট ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনের মধ্য দিয়ে সমগ্র মানব জাতিকে অভিন্ন সত্বায় গড়ে নিতে ভাষার সম বিকাশ ও সম মর্যাদার বিকল্প কিছু নেই। বাংলাদেশের শাসকগোষ্ঠী জুম্মদের মাতৃভাষাকে প্রাথমিক স্তরে প্রচলনের জন্য যেসকল সমস্যার কথা তুলে ধরে তার চাইতে তারা বেশী ভয় পায় জুম্মদের ভাষার বিকাশকে। ভাষার বিকাশ ঘটলে সে জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। এতে শাসকগোষ্ঠীর অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হবে না। তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যেভাবে বাংলা ভাষা ভিত্তিক শক্তি ও ঐক্যকে ভয় পেয়েছিল বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ভাষার প্রাথমিক স্তরে চালুকরণের ক্ষেত্রে সেই ভয় তাদের তাড়া করছে। কেননা পাকিস্তান বিদায় নিলেও শাসকের চরিত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি।

বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো প্রাত্যহিক জীবনাচরণে মাতৃভাষার বৈ বিকল্প কিছু নেই। জুম্মদেরকে মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষার স্তরে পড়াশোনা করার মতো ভাষার অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এমনকি বাংলা ভাষাও তার সুযোগ সবক্ষেত্রে থাকে না। অপেক্ষাকৃত পরিচিত ভাষা হিসেবে তখন ইংরেজী ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। এ অবস্থায় দাঁড়িয়ে জুম্মদেরকে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষিত করা একান্ত জরুরী। মুখে ফেয়ার এন্ড লাভলী মেখে আর পেটে ক্ষুধা রেখে যেমনি মুখের লাবণ্য ও রূপ ধরে রাখা যায় না তেমনি দরিদ্র মানুষের পক্ষেও কেবলমাত্র শিক্ষার উদ্যোগ নিয়ে তাদের শিক্ষার আলো দেয়া যাবে না। রাজনৈতিক বঞ্চনা ও নির্যাতনের উত্তরণ ঘটালেই কেবল অপরাপর সমস্যাদির সমাধানের প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে নেয়া সম্ভব।

বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংকটের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার সমস্যাকে গুলিয়ে ফেললে সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। তাই পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষার অতীত অবস্থা ও জাতিগুলির চাওয়া পাওয়ার যথাযথ মূল্য প্রদান করে এর সমাধান খুঁজে বের করতে সরকারকে সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করতে হবে। সালাম, রফিক, জব্বার ও বরকতের মতো যেন জুম্ম ছাত্র-লেখকদের রক্ত দিতে না হয় সে ব্যাপারে দেশের প্রগতিশীল, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদ ও মাতৃভাষা প্রিয় ব্যক্তিদের এগিয়ে আসার জন্য বিনীত আহ্বান রইল।

তথ্যসূত্র ঃ

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে আদিবাসী ভাষা প্রয়োগ প্রস্তাবনা- আলোচনাপত্র ২০০৩। - সুখেশ্বর চাকমা। ২। মাতৃভাষা ঘোষণাপত্র ২০০১, নুঅ পহর। ৩। পার্বত্য চট্টগ্রামের মাতৃভাষা ও প্রাথমিক স্তরে এর প্রচলন- তনয় দেওয়ান, আমানিকক, হিল ট্রাক্টস এনজিও ফোরাম ২০০২।

৪। দি ট্রাইবেল ল্যাংগুয়েজ অব সিএইচটি- সুগত চাকমা। ৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি- সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

৬। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা চালু করা প্রসঙ্গে- তনয় দেওয়ান, নুঅ পহর প্রকাশনা, ২০০১ইং।

৭। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষাঃ রাঙামাটি পার্বত্য জেলায় সম্ভাব্যতা যাচাই- হেমল দেওয়ান, লামপ্রা ২০০২, জাক।

৮। আদিবাসীদের শিক্ষা সংকট ও উত্তরণের প্রস্তাবনাঃ প্রেক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম- মংক্যশোয়েনু নেভী।

৯। হিল ট্রাক্টস এনজিও ফোরাম ও জাক এর ২০০২ সালের মাতৃভাষা দিবসের সুপারিশমালা।

সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হলো লংগদু'র দু'টি জুম্ম গ্রাম ॥ ৬৫ পরিবার উদ্বাস্তু

গত ২০ মার্চ ২০০৩ উগ্র সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবাজ সেটেলারদের হামলার শিকার হলো রাঙ্গামাটি জেলাধীন লংগদু উপজেলার দু'টি জুম্ম গ্রাম। গ্রাম দু'টি হলো গুলশাখালী ইউনিয়নের শান্তিনগর ও জারুলছড়া গ্রাম। সেটেলাররা গ্রামবাসীদের নির্বিচারে মারধোর করেছে এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে পুলিশের নিকট সোপর্দ করেছে। দু'টি গ্রামে প্রায় ৬০টি বাড়ীতে লুটপাট চালায়। আরো হামলার আশঙ্কায় দু'টি গ্রাম এখন জনশূণ্য। তারা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। সহায় সম্বল সবকিছু হারিয়ে তারা এখন দুর্বিষহ মানবেতর জীবন কাটাচ্ছে।

জানা যায় যে, সেদিন সকাল ১০ ঘটিকার সময় গুলশাখালী গ্রামে একদল সেটেলার বাঙালী গাছ চুরি করতে গেলে স্থানীয় কিছু উচ্ছৃঙ্খল পাহাড়ী কর্তৃক মারধোরের শিকার হন। সেটেলার বাঙালীরা তাদের গ্রামে ফিরে এটা ব্যাপক প্রচার করে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ায়। পরে বেলা ২টার দিকে সংঘবদ্ধ হয়ে গুলশাখালী ইউনিয়নের উক্ত দু'টি গ্রামে হামলা চালায়। তারা গ্রামে যাদেরকে পেয়েছে তাদেরকে নির্বিচারে মারধোর করেছে। এমনকি ধান কল ও ধান নষ্ট করে দেয়। এ সময় স্থানীয় একটি বৌদ্ধ বিহারে গ্রামবাসীরা বুদ্ধ পূজা অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা করছিল। সেখানে যাকে পেয়েছে তাকে সেটেলাররা ধরে নিয়ে যায়। পরে একজন মহিলাসহ ১৫ জন গ্রামবাসীকে ধরে নিয়ে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। এরা হলো - শান্তিনগর গ্রামের (১) বিভীষন চাকমা পীং মনিরাম চাকমা, (২) আলো জ্যোতি চাকমা পীং প্রভাত চন্দ্র চাকমা, (৩) নাগর চান চাকমা পীং রেবতী রঞ্জন চাকমা, (৪) পূর্ণ কুমার চাকমা পীং বিন্দু কুমার চাকমা (৫) জ্যোতিময় চাকমা পীং যুদ্ধমুনি চাকমা, (৬) শুদ্ধধন চাকমা পীং নিগিরা চন্দ্র চাকমা ও (৭) বিনয় চন্দ্র চাকমা পীং দল মোহন চাকমা এবং জারুলছড়া গ্রামের (৮) অতুলময় মাষ্টার, (৯) হিরংকানী চাকমা, (১০) অগা চাকমা, (১১) উপেন্দ্র চাকমা, (১২) জন্টু চাকমা বরমুয়া, (১৩) কনক বরণ চাকমা, (১৪) মুরতি চাকমা ও (১৫) সম্রাট চাকমা প্রমুখ। পরে অন্যান্যদের ছেড়ে দিলেও আলোজ্যোতি চাকমা পীং প্রভাত চন্দ্র চাকমা এবং জ্যোতিময় চাকমা পীং যুদ্ধমনি চাকমাকে পুলিশ ২২ মার্চ ২০০৩ রাঙ্গামাটি চালান দেয়।

জুম্ম বসতির উপর হামলা চলাকালে কয়েকজন গ্রামবাসী পার্শ্ববর্তী রহমতপুর এপিবিএন ক্যাম্পে গিয়ে সাহায্যের প্রার্থনা করলে ক্যাম্প কর্তৃপক্ষ বলে যে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া তারা কিছুই করতে পারবে না। পরে জনসংহতি সমিতির স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহায়তায় পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাটি যাতে আর গড়াতে না পারে সে বিষয়ে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ আলোচনা করতে গেলে রাঙামাটি জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ও স্থানীয় মুরুব্বী মোঃ নাছির এই মর্মে জুম্মদের কাছ থেকে শর্ত দেন যে, সেটেলাররা গাছ কাটতে গেলে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হবে। সেটেলাররা জুম্মদের বাগান-বাগিচা থেকে গাছ চুরি করতে যাবে আর তাতে জুম্মদের উদ্যোগে সেটেলারদের নিরাপত্তা দিতে হবে - এরূপ উদ্ভট শর্ত শুনে স্থানীয় জুম্মরা হতবাক হয়ে যায়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নিরাপত্তার অভাবের কারণে জুম্মরা এখনো গ্রামে ফিরেনি। পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসনের তরফ থেকে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং পরিস্থিতি আরও চরম আকার ধারণ করতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছে। অপরদিকে লুটপাটের শিকার এবং উদ্বাস্তু হয়ে যারা ভাসমান জীবন কাটাচ্ছে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের তরফ থেকে কিছু সাহায্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেই সাহায্য অত্যন্ত অপ্রতুল। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন সাহায্য দেয়া হয়েছে বলে জানা যায়নি। লুটপাটের ফলে যাদের সর্বস্ব খোয়া গেছে তারা হলো -

(১) মঙ্গল চন্দ্র চাকমা পীং দল মোহন চাকমা; (২) বিভীষন চাকমা পীং মনিরাম চাকমা; (৩) সুশীল কুমার চাকমা; (৪) বিন্দু কুমার চাকমা পীং গোপাল চন্দ্র চাকমা; (৫) সোনারাম চাকমা পীং কেবল চন্দ্র চাকমা; (৬) মহেন্দ্র চাকমা পীং বিজয় কুমার চাকমা; (৭) ললিত কুমার চাকমা পীং আনন্দ মোহন চাকমা; (৮) সুন্দর কুমার চাকমা পীং যুদ্ধমনি চাকমা; (৯) কালা চিজি চাকমা পীং চন্ডীচরণ চাকমা; (১০) রবিরায় চাকমা পীং ভরত কুমার চাকমা; (১১) আনন্দ মোহন চাকমা পীং মৃত কামিনী চন্দ্র চাকমা; (১২) সুমতি কুমার চাকমা পীং নিশিচন্দ্র চাকমা; (১৩) বেরতি কুমার চাকমা পীং পুনং চান চাকমা; (১৪) রসিক মোহন চাকমা পীং কামিনী চন্দ্র চাকমা; (১৫) শুদ্ধধন চাকমা পীং নিগিরা চন্দ্র চাকমা; (১৬) বিনয় চন্দ্র চাকমা পীং দল মোহন চাকমা; (১৭) বাদী চান চাকমা পীং সুদর্শন চাকমা; (১৮) চিরজ্যোতি চাকমা; (১৯) মনো রঞ্জন চাকমা পীং পুনংচান চাকমা; (২০) নাগর চান চাকমা পীং রেবতি রঞ্জন চাকমা; (২১) পূর্ণ কুমার চাকমা পীং বিন্দু কুমার চাকমা; (২২) আলো জ্যোতি চাকমা পীং প্রভাত চন্দ্র চাকমা; (২৩) জ্যোতিময় চাকমা পীং যুদ্ধ মনি চাকমা; (২৪) নবীন চাকমা (কার্বারী) পীং কামিনী চন্দ্র চাকমা; (২৫) রতন মনি কার্বারী পীং সুশান্ত চাকমা; (২৬) সুশীল দীপক দেওয়ান পীং সুদর্শন দেওয়ান; (২৭) গঙ্গারাম চাকমা পীং কেবল চন্দ্র চাকমা।

বড়াদম আর্মী ক্যাম্প কমান্ডার কর্তৃক হয়রানি

কাপ্তাই রিজিয়নের অধীন বড়াদম আর্মী ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা সাধারণ লোকের উপর বিনা কারণে হয়রানি করে চলেছে। গত ১২ মার্চ ২০০৩ উক্ত ক্যাম্পের কমান্ডার হাফেজ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন আওলাদ বাজারের ব্যবসায়ী তুহিন চাকমাকে কোন ওজর আপত্তি ছাড়া কান ধরে উঠাবসা করিয়েছে। তাছাড়া সুমন চাকমা, শান্তিময় চাকমা, নিকোবর চাকমা, সুখময় চাকমা, সুরেশ চাকমা ও মিন্টু চাকমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে চরম অপমান করেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, উক্ত দিনে আকাশে মেঘ জমে বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দেয়। তাই তুহিন চাকমা চাউল তোলার জন্য কিছু কুলি ঠিক করে। কিন্তু তুহিন চাকমা যে সকল কুলি ঠিক করেছিল সেকল কুলিদের সাথে ক্যাম্প কমান্ডার হাফিজ খেজুরে আলাপ করতে থাকে। তখন তুহিন চাকমা তার কুলিকে ডেকে পাঠায়। অন্যদিকে তখন ঐ কুলির সাথে হাফেজ কথা বলছিল। তাতে হাফিজ প্রচন্ড রেগে যায় এবং উক্ত অমানবিক আচরণ করে।

নানিয়ারচরে ইউপিডিএফ ও সেনা কর্মকর্তার বৈঠক

গত ১৭ মার্চ ২০০৩ রাঙ্গামাটি জেলাধীন নানিয়ারচর সেনা জোন (১৮ বেঙ্গল)-এর কম্যান্ডার কদুরত এলাহী রহমান শফিক ও নানিয়ারচরস্থ ইউপিডিএফের স্থানীয় কম্যান্ডার শান্তিদেব চাকমা ওরফে তড়িৎ এর মধ্যে নানিয়ারচর সেনা জোন কার্যালয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। রাঙ্গামাটি সদর উপজেলাধীন কুতুকছড়ি বাজারে যেভাবে প্রকাশ্য অফিস স্থাপন করেছে সেভাবে নানিয়ারচর উপজেলা সদরেও ইউপিডিএফের একটি অফিস খোলার বিষয়ে দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা মোতাবেক আগামীতে ইউপিডিএফ নানিয়ারচর উপজেলা সদরে একটি অফিস খুলবে বলে জানা যায়। উল্লেখ্য যে, সেনা ক্যাম্প সংলগ্ন কুতুকছড়ি বাজারে স্থাপিত অফিসে ইউপিডিএফ সদস্যরা সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করে চাঁদাবাজি করে আসছে।

ইউপিডিএফ কর্তৃক বাঘাছোলায় অপহরণ

ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্যদের অপহরণ ও বাড়ীঘরে অগ্নি সংযোগের শিকার হয়েছে বাঘাছোলা গ্রামের সাধারণ লোকজন। গত ১২ মার্চ ২০০৩ রাত ১১.০০ ঘটিকার সময় রাঙ্গামাটি জেলার বরকল উপজেলাধীন সুবলং-এর বাঘাছোলা গ্রামে চুক্তি বিরোধী ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্যরা ৪টি বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং ৭ জন গ্রামবাসীকে অপহরণ করেছে। ঘটনার দিনে ইউপিডিএফ সদস্যরা মাইসছড়ি এলাকা থেকে দু'টি টেম্পু বোট নিয়ে এসে প্রথমে কাঞ্চন তালুকদারের বাড়ী ঘেরাও করে এবং তৎমুহূর্তে কাঞ্চন তালুকদার হারিকেন নিয়ে বের হলে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী গ্রামবাসীদেরকে ঘুম থেকে তুলে এনে একে একে ৭ জনকে আটক করে। আটক করার পর দুদুমনি চাকমা, সতেন্দ্র তালুকদার, যুগেন্দ্র চাকমা ও কালাবী চাকমা (বিধবা) এর বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। অগ্নিসংযোগের ফলে কেবলমাত্র পরনের কাপড়-চোপড় ব্যতীত বাড়ীর সবকিছু ভস্মীভূত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে পাশ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা চিৎকার শুরু করে এবং সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। একপর্যায়ে বাঘাছোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাঞ্চন তালুকদার (৫৫) পীং ক্ষিতেন্দ্র নাথ তালুকদার, দুদুমনি তালুকদার (৫০) পীং সুধীর চন্দ্র তালুকদার, কালাচান চাকমা (৫৫) পীং হরিশ্চন্দ্র চাকমা, মধুময় চাকমা (৩০) পীং কালাচান চাকমা, তরিৎ চাকমা (২৫) পীং কালাচান চাকমা, খোকন চাকমা (২৮) পীং কালাচান চাকমা, রত্ন শংকর চাকমা (৩২) পীং হেম রঞ্জন চাকমা প্রমুখ ৭ জন গ্রামবাসীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ঘটনার সাথে সাথে স্থানীয় সেনা ক্যাম্পে জানানো হয়। কিন্তু অনেক পরে সেনাবাহিনী লোক দেখানো তল্লাসী চালায়। সঠিক তথ্য দেয়া সত্বেও সেনাবাহিনী নির্দিষ্ট জায়গায় না গিয়ে অন্যদিকে গিয়ে ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্যদের পালাবার সুযোগ করে দেয়।

উল্লেখ্য যে, ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্যরা বরকল উপজেলাধীন ভিজাকিজিং (চিবা) ক্যাম্প থেকে আনুমানিক মাত্র ৬/৭ শত গজের উত্তরে বেতছড়ি নামক স্থানে রীতিমত পোষ্ট বসিয়ে চাঁদাবাজি করে আসছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজন একপ্রকার বন্দী জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। ইউপিডিএফ সদস্যদের অনুমতি ছাড়া গ্রামবাসীদের কোথাও যাবার অনুমতি নেই। এসব জানা সত্বেও ভিজাকিজিং ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। জানা যায় যে, মাছছড়ি জুনিয়র হাই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ও বর্তমান ইউপিডিএফের বেতছড়ি কালেকশন পোষ্টের কম্যান্ডার বিমল চাকমার সাথে মাছছড়ি ক্যাম্পের অধিনায়ক সুবেদার জয়নালের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। বিগত ঈদের সময়ও বিমল চাকমা তাঁর লোক দিয়ে ক্যাম্পে সুবেদার জয়নালের সাথে ঈদের প্রয়োজনীয় খাদ্য রসদ সরবরাহ করেছে বলে জানা যায়। এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় ইউপিডিএফ সশস্ত্র সদস্যদের এলাকায় অবাধে ও নিরাপদে চাঁদাবাজি, অপহরণ, হত্যা ইত্যাদি সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে কোন অসুবিধা হয় না।

চট্টগ্রামে পিসিপি কর্মী অপহরণের চেষ্টা

গত ১৪ মার্চ ২০০৩ ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীরা পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) চট্টগ্রাম পলিটেকনিক শাখার অর্থ সম্পাদক ভবতোষ চাকমাকে জোরপূর্বক অপহরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। উক্ত দিনে চট্টগ্রাম মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কাউন্সিলে যোগদানের পর বিকেল বেলায় পলিটেকনিক হোস্টেলে ফেরার পথে তাকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। জানা গেছে যে, ইউপিডিএফ এর চিহ্নিত সন্ত্রাসী নেতা প্রভু রঞ্জন চাকমা ও স্বরূপ চাকমার নেতৃত্বে একদল সন্ত্রাসী ভবতোষ চাকমার উপর হামলা চালায়। এসময়ে পলিটেকনিকের সাধারণ ছাত্র ও শিক্ষকরা ভবতোষ চাকমাকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে আসলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পালানোর সময়ে শিবলী নামের জনৈক সন্ত্রাসী সাধারণ ছাত্রদের হাতে ধরা পড়ে।

বিলাইছড়িতে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পরিবর্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন

রাঙামাটি জেলার বিলাইছড়ি উপজেলায় আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের পরিবর্তে আর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নরা চলে যেতে শুরু করেছে এবং আর্মীরা তাদের স্থানে অবস্থান নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর্মীরা শুধু বিলাইছড়ি হেড কোয়ার্টার নয়, সাক্রাছড়ি ও গাছকাটা ছড়া ব্যাটালিয়ন ক্যাম্পেও অবস্থান নেবে বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য যে, এতদিন ধরে বিলাইছড়িতে আর্মী ও আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন মোতায়েন ছিল।

আর্মীরা এখন ব্যাটালিয়ন পুলিশের এইসব জায়গায় অবস্থান নেয়ার পর গোটা বিলাইছড়িতে অপারেশন চালানোর পরিকল্পনা করছে বলেও এলাকাবাসী মনে করছে। এতে সাধারণ লোকজনের কাছে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে এবং চুক্তি-উত্তর সময়ে সেনা ক্যাম্প গুটিয়ে না নিয়ে নতুন করে সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ দেখে তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। কেননা চুক্তিতে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের ক্যাম্প প্রত্যাহারের কথাও উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু তাদের ধারণা ব্যাটালিয়ন পুলিশের পরিবর্তে কেবল মাত্র আর্মীরা এই এলাকায় অবস্থান নেওয়ার মাধ্যমে এলাকায় পরিস্থিতির চরম অবনতি হতে পারে। এলাকাবাসী ব্যাটালিয়ন ক্যাম্প প্রত্যাহার করার পাশাপাশি আর্মী ক্যাম্প প্রত্যাহারেরও দাবী জানাচ্ছে। জানা গেছে, খাগড়াছড়ি জেলায়ও কয়েক স্থানে আর্মস ব্যাটেলিয়ন জওয়ানদের প্রত্যাহার করে নিয়ে তদস্থলে সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে।

ইউপিডিএফ সন্ত্রাসীর উড়ো চিঠির মাধ্যমে চাঁদা দাবী

ইউডিপিএফ সন্ত্রাসীরা এখন উড়ো চিঠির মাধ্যমে চাঁদা আদায়ের নতুন ফন্দি বের করেছে। লক্ষীছড়ি উপজেলার হ্লাপ্রুচাই মারমা (চাইহ্লা প্রু) পিতা ক্যজরী মারমা নামের ইউপিডিএফ সন্ত্রাসী এই নতুন ধরনের চাঁদাবাজীর হোতা। বেশ ক'দিন ধরে তিনি মানিকছড়ি উপজেলার উসুরিয়ান্দা মারমা পীং নিসাই মারমাকে এভাবে চাঁদা প্রদানের জন্য হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। উসুরিয়ান্দা মারমা এব্যাপারে ইতিমধ্যে মানিকছড়ি থানায় চাইহ্লা প্রু'র বিরুদ্ধে জিডি (জিডি নং-১১৬৯ তারিখ ৩০/৪/০২) করেছে। নতুন করে তার কাছে আবারও উড়ো চিঠির মাধ্যমে চাঁদা দাবী করা হচ্ছে। গত ২ জানুয়ারী ২০০৩ উক্ত সন্ত্রাসী সরাসরি উসুরিয়ান্দা মারমাকে জিজ্ঞেস করে যে, উড়ো চিঠি পেয়েছে কি-না? পেয়ে থাকলে কেন এতদিন চাঁদা দিচ্ছে না? এরপর আবার ৭ জানুয়ারী উক্ত সন্ত্রাসী মানিকছড়ি বাজারের কুলিং কর্ণারের দোকানে পেলে উসুরিয়ান্দা মারমাকে হুমকি দেয়। সে সাথে জনসংহতি সমিতির সাথে কোন সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশ দেয়। এমনকি তার বাড়ীগুলো যেন জনসংহতি সমিতির সদস্যদেরকে ভাড়া না দেয় সে ব্যাপারেও সতর্ক করে দেয়। সম্প্রতি উড়ো চিঠির অত্যাচার বেড়ে চলেছে এবং চিঠির মাধ্যমে চাঁদা না দিলে খুন, অপহরণ, বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করা হবে বলে হুমকি প্রদান করা হচ্ছে।

মানিকছড়িতে জেএসএস কর্মী অপহৃত

১১ মার্চ ২০০৩ গভীর রাতে খাগড়াছড়ি জেলাধীন মানিকছড়ি উপজেলার নিজ বাড়ী থেকে বাদল কান্তি ত্রিপুরা (৩৫) নামে জনৈক গ্রামবাসীকে অস্ত্রের মুখে ইউপিডিএফের সশস্ত্র সদস্যরা অপহরণ করে।.তিনি এক সময় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মানিকছড়ি থানা কমিটির প্রাক্তন দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আজ অবধি তাকে ছেড়ে দেয়া হয়নি।

পিসিপি নেতা মিলন বিকাশ ত্রিপুরার উপর ইউপিডিএফের হামলা

গত ৮ মার্চ ২০০৩ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি মিলন বিকাশ ত্রিপুরাকে ইউপিডিএফের সন্ত্রাসীরা হামলা করে। মিলন বিকাশ ত্রিপুরা সেদিন নিজ বাড়ী থেকে খাগড়াছড়ি জেলা সদরে আসার সময় বিকাল ৫ ঘটিকায় মাটিরাঙ্গা পৌছলে ইউপিডিএফের সমস্ত্র সদস্যরা তার উপর চড়াও হয়। তাঁর উপর এই বর্বর ও কাপুরুষোচিত হামলার জন্য পিসিপি জেলা কমিটি তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং সন্ত্রাসী ইউপিডিএফের সদস্যদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের দাবী জানায়।

সরকার আঞ্চলিক পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে - সন্তু লারমা

সকল নিয়ম-নীতিকে উপেক্ষা করে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে এ অঞ্চলে বসবাসরত পাহাড়ী-বাঙ্গালী স্থায়ী অধিবাসীদের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই বেশী হচ্ছে। এখানকার সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো যে যার মত করে চলছে। কেউ কারো কথা মানছে না। গত ৪ মার্চ ২০০৩ বান্দরবান সার্কিট হাউজে ইউনিসেফের বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা ওরফে সন্তু লারমা একথা বলেন। তিনি আরও বলেন, জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ স্বাক্ষর প্রদান করলেও সরকার তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করছে না। দেশের শিক্ষানীতি বিভেদপূর্ণ ও বৈষম্যে ভারাক্রান্ত। এই অবস্থায় শিশুদের মানসিক বিকাশ এবং শিক্ষার সঠিক বিস্তার সম্ভব নয়। শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে প্রচলিত পুরাতন সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়ে তোলার জন্য সমাজ সচেতন মানুষের এগিয়ে আসতে হবে। শিশুরা যাতে উন্নত, আদর্শ ও প্রগতিশীল মন-মানসিকতা নিয়ে বেড়ে উঠতে পারে সেভাবে শিক্ষানীতিকে ঢেলে সাজাতে হবে। এক পর্যায়ে অনুষ্ঠানে বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের কোন প্রতিনিধিত্ব না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের সমন্বয়ের অভাবের কারণে এ অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত হচ্ছে না বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সন্তু লারমা প্রতিবেদনের মোড়ক উন্মোচন করেন। একটি মেয়ে শিশু আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে রিপোর্টটি তুলে দেয়ার পর তিনি তা উন্মোচন করে। ইউনিসেফের চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রধান আলমগীর ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান জেলা প্রশাসক হাফিজুর রহমান ভূঁইয়া, ইউনিসেফ কর্মকর্তা উবাশৈ মারমা, ডাঃ অংশৈপ্রু চেধুরী, মোঃ ওসমান গনি, এ কে এম জাহাঙ্গীর, আমিনুল ইসলাম বাচ্চু, মোঃ জাকারিয়া প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া কয়েকজন শিশু-কিশোরও তাদের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিভিন্ন চিত্র তুলে ধরে।

নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গঠনে ছাত্রছাত্রীদের সচেষ্ট হতে হবে - সন্তু লারমা

নবীন ছাত্রছাত্রী বন্ধুদের প্রথমে দৃষ্টি রাখতে হরে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে এসেছেন সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা যাতে অক্ষুন্ন থাকে। নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গঠনে ছাত্রছাত্রীদের সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষার মাধ্যমে যথাযথ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। সেজন্য কেবল ক্লাশের বই পড়লে হবে না, প্রগতিশীল আদর্শের বইও পাঠ করতে হবে। উগ্র জাতীয়তাবাদী ও মৌলবাদী চরিত্র কারো জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। গত ১৯ মার্চ ২০০৩ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ রাঙামাটি কলেজ শাখার উদ্যোগে রাঙামাটি সরকারী কলেজের ২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নবীন বরণ প্রধান অতিথির ভাষনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সভাপতি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা একথা বলেন। তিনি আরো বলেন যে, যে সমাজ বিপর্যস্ত সন্ত্রস্ত সে সমাজে শিক্ষার যথাযথ অধিকার অর্জন করা কঠিন। তাই কেবল ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বা পেশাগত জীবনে সফল হয়ে শিক্ষিত হওয়া যায় না বরং সমাজের জন্য কাজ করাই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে নবীনদের সচেষ্ট হতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ এই কলেজের বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে সম্ভব সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করে যাবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

নবীন বরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন ধনা চাকমা। বিশেষ অতিথি হিসবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজকর্মী নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, শিশির চাকমা, উমে মং, তনয় দেওয়ান, পিসিপির সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা, সাধারণ সম্পাদক সুদীর্ঘ চাকমা, অর্থ সম্পাদক টুলু মারমা। নবীনদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করেন ফ্রিজিয়া তালুকদার। স্বাগত বকতব্য রাখেন অত্র শাখার সাধারণ সম্পাদক নিকো চাকমা। নবীনদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন দীপন চাকমা। সভাশেষে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ ও কলেজের নবীন প্রবীন ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত করা হয়।

পিসিপি'র চট্টগ্রাম মহানগর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন সমাপ্ত

গত ১৪ মার্চ চট্টগ্রামের শহীদ মিনার চত্বরে চট্টগ্রাম মহানগর, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক শাখার সম্মেলন উপলক্ষ্যে ছাত্রনেতা রেবতী রঞ্জন চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক উষাতন তালুকদার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিবির চট্টগ্রাম জেলার সাধারণ সম্পাদক কমরেড শাহ আলম, বাসদ চট্টগ্রামের সমন্বয়ক কমরেড রাজেকুমজ্জামান, জনসংহতি সমিতির চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক তাপস ত্রিপুরা ও পিসিপির কেন্দ্রীয় সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উষাতন তালুকদার বলেন যে, বর্তমান বিএনপির নেতৃত্বে চার দলীয় জোট সরকার দেশকে চরম সংকটের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির এতই খারাপ যে, মানুষ নিরাপদে থাকতে পারছে না, সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের উপর নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেছে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন যে, এই সরকারও আওয়ামী লীগ সরকারের মত চুক্তি বাস্তবায়ন করছে না। আন্দোলনের মাধ্যমে এ সরকারকে চুক্তি বাস্তবায়নে বাধ্য করতে হবে। তিনি ইউপিডিএফ প্রসঙ্গে বলেন যে, সরকারের একটি বিশেষ মহল তাদের আশ্রয় প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে যাচ্ছে। তাই তারা নির্বিঘ্নে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাচ্ছে। জনগণকে

ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের মোকাবেলা করতে হবে। সম্মেলনে রেবতী রঞ্জন চাকমাকে সভাপতি ও ক্যা ক্য মং মারমাকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট চট্টগ্রাম মহানগর শাখা গঠন করা হয়। আনন্দ জ্যোতি চাকমাকে সভাপতি ও প্রিয়দর্শী চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠন করা হয়। তাছাড়া শ্যামল চাকমাকে সভাপতি ও সুপ্রীম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক করে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট শাখা গঠন করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনসহ সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ কর - দাবীতে নারী দিবস পালিত

পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে 'পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনসহ সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ কর' - এই দাবীতে তিন পার্বত্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। এই দিবসটি উপলক্ষ্যে দুই সংগঠন যৌথভাবে 'জাগরণ' নামে একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে।

এ দিবসটি উপলক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সভাপতি মাধবী লতা চাকমার সভাপতিত্বে রাঙ্গামাটি পৌর মিলনাতনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নানিয়ারচর উপজেলাধীন ছয়কুড়ি বিল মৌজার হেডম্যান বসুন্ধুরা দেওয়ান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরের রাঙ্গামাটি জেলার প্রাক্তন পরিচালক আরতি চাকমা, শিল্প উদ্যোক্তা বেইন টেক্সটাইলের স্বত্ত্বাধিকারী মঞ্জুলিকা খীসা, পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সাধারণ সম্পাদক উমে মং, বিশিষ্ট সমাজসেবক নির্মলেন্দু ত্রিপুরা, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অর্থ সম্পাদক সত্যবীর দেওয়ান, আদি ও স্থায়ী বাঙালী নেত্রী নুরজাহান, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক থুইম্রানু মারমা ও পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুদীর্ঘ চাকমা। বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরের পর জুম্ম নারীদের উপর সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের যৌথ হয়রানি, নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ অব্যাহত থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা অবিলম্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জোর দাবী জানান। সভা পরিচালনা করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাংগঠনিক সম্পাদক সুপ্রভা চাকমা।

খাগড়াছড়িতে দিবসটি উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সকাল ১০টায় পানখাইয়া পাড়ার বটতলা থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালী শুরু হয়। খাগড়াছড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান মংক্যচিং চৌধুরী র‍্যালী উদ্বোধন করেন। র‍্যালীটি হাসপাতাল রোড, আদালত রোড হয়ে শহর প্রদক্ষিণ করে মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। সূর্যশিখা ক্লাবের প্রাঙ্গণে পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী নির্যাতনসহ সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ কর শ্লোগানকে সামনে রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতির সহ সভাপতি জ্যোতিপ্রভা লারমার সভাপতিত্বে দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সদস্য সুধাসিন্ধু খীসা। আলোচনা সভায় বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতির মহিলা বিষয়ক সম্পাদক জড়িতা চাকমা, খাগড়াছড়ি হেডম্যান এসোসিয়েশনের সভাপতি শক্তিপদ ত্রিপুরা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি চৈতালী ত্রিপুরা, মিলনপুর মহিলা সমিতির সভাপতি ইন্দ্রিরা চাকমা, আদি ও স্থায়ী বাঙালী কল্যাণ পরিষদের নেতা গফুর আহমেদ তালুকদার, জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সন্তোষিত চাকমা বকুল, খাগড়াছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান সমিতির সভাপতি খগেশ্বর ত্রিপুরা। আলোচনা সভা শুরুর আগে গিরিসুর শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীরা গণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে সুধাসিন্ধু খীসা বলেন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক যুগে নারীরা এখনো তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে। সকল ক্ষেত্রে নারী মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা না গেলে প্রকৃত সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করে।

নেমকিন বমের সভাপতিত্বে ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী মেঞ্চোচিং মারমার পরিচালনায় বান্দরবান রাজবাড়ী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য ও পার্বত্য চট্টগ্রাম মহিলা সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সভাপতি উনু প্রু মারমা। সভায় বক্তব্য প্রদান করেন জনসংহতি সমিতি বান্দরবান জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক দেনদোহা জোলাই ত্রিপুরা, উর্মি চৌধুরী ও হাজাই প্রু মারমা। প্রধান অতিথির ভাষণে উনু প্রু মারমা বলেন যে, শান্তি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নসহ নারী সমাজের উপর নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। তিনি জাতীয় সংসদে তিন পার্বত্য জেলার জন্য তিনটি মহিলা আসন সংরক্ষণেরও দাবী জানান।

বান্দরবান পিসিপি কর্তৃক অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালিত

গত ১৫ মার্চ ২০০৩ পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ (পিসিপি) বান্দরবান জেলা শাখা কর্তৃক বান্দরবান রাজার মাঠ সংলগ্ন বটতলায় অশুভ শক্তি প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে পিসিপি জেলা শাখা কর্তৃক মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়। পুশৈ থোয়াই মারমার সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি উজ্জ্বল চাকমা। জনসংহতি সমিতির উছো মং, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ওয়াইচিং প্রু মারমা, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক থুইম্রানু মারমা, পিসিপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিনতাময় ধামাই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৫ সালের ১৫ মার্চ বান্দরবান সদরে পিসিপির জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠানকালে একটা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেটেলাররা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ায়। এপ্রেক্ষিতে পিসিপির সভা-সমাবেশ ও মিছিলের উপর জেলা প্রশাসন ১৪৪ ধারা জারি করে। উক্ত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পিসিপি বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ ও সেনাবহিনীর সহায়তা সেটেলাররা হামলা করে এবং জুম্মদের ঘরবাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে। এতে প্রায় তিন শতাধিক জুম্ম ঘরবাড়ী ভস্মিভূত হয়। কয়েক ডজন পিসিপি নেতা-কর্মী আহত হয়। পুলিশ বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এই একতরফা সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে প্রতি বছর পিসিপি কর্তৃক অশুভ শক্তি প্রতিরোধ পালিত হয়ে আসছে।

পিসিজি'র সাধারণ সম্পাদকের শ্রীলংকা সফর

দিল্লী ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন পিস ক্যাম্পেইন গ্রুপের (পিসিজি) সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষু ২৮ ফেব্রুয়ারী হতে ১০ মার্চ ২০০৩ পর্যন্ত এগার দিনব্যাপী শ্রীলংকায় সফর করেন। সফরকালে তিনি শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতির সিনিয়র উপদেষ্টা মিঃ লক্ষণ জয়কোডে, বৌদ্ধশাসনা, বিচার, আইনী সংস্কার ও জাতীয় সংহতি বিষয়ক মন্ত্রী মিঃ ডব্লিউ জে এম লোকুবন্দারা এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব মিঃ হেম শ্রীবর্ধনা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁদের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে কথা বলেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য তাদের সমর্থন চেয়ে শ্রীলংকার রাষ্ট্রপতি মিজ চন্দ্রিকা বন্দরনায়েকে কুমারাতুঙ্গা এবং বৌদ্ধশাসনা, বিচার, আইনী সংস্কার ও জাতীয় সংহতি বিষয়ক মন্ত্রী মি. ডব্লিউ জে এম লোকুবন্দারা এর বরাবরে পৃথক পৃথক স্মারকলিপিও প্রদান করেন। উক্ত স্মারকলিপিতে তিনি নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় তুলে ধরেন -

১। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন প্রদান করা।

২। শ্রীলংকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ সিভিল সার্ভিস, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও গণ যোগাযোগ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা এবং

৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে শ্রীলংকায় আসা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কলম্বোয় একটি বৌদ্ধ ধর্ম গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কলাকৌশলগত সহায়তা প্রদান করা।

শ্রীমৎ ভিক্ষু শ্রীলংকার মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি ও জাপানের মহা সংঘনায়ক শ্রীমৎ বানাগালা উপতিষ্যসহ আরও কয়েকজন বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সামাজিক কল্যাণ, শিক্ষা ও পরিবেশসহ সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী ও নীতি নির্ধারণী বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি ৭ মার্চ ২০০৩ কলম্বোর শান্তি পদনামা সেরুওয়ালা বৌদ্ধ কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বর্তমান সরকার কর্তৃক ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি লঙ্ঘনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। উক্ত সেরুওয়ালা বৌদ্ধ কেন্দ্রের সভাপতি শ্রীমৎ কে অমরকীর্তি থেরো, প্রখ্যাত মানবাধিকার ও সমাজকর্মী শ্রীমৎ প্রিয়তিষ্য ভিক্ষু এবং শ্রীলংকার গ্রীন মুভমেন্টের প্রধান সংগঠক মিঃ সুরঞ্জন কোডিথুওয়াক্কুও উক্ত সাংবাদিক সম্মেলন আয়োজনে তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেন। সম্মেলনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সেটেলারদের দ্বারা বিগত দু' দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের উপর সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘন ও গণহত্যার উপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া তিনি ৮ মার্চ ২০০৩ কলম্বোয় বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত শ্রীলংকার জাতীয় ভিক্ষুসংঘ সম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন। এতে দ্বীপ রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দু' শতাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, শান্তিকামী বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে জাপান পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি যথাযথ ও দ্রুত বাস্তবায়নের শর্তাধীনে বাংলাদেশ সরকারকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে জুম্ম জনগণের দুর্দশা লাঘবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ যেন তাদের ঐতিহ্যগত ভূমিতে বসবাস করতে পারে তজ্জন্য জুম্ম জনগণের প্রতি সমর্থন দানের জন্য সম্মেলনে উদাত্ত আহ্বান জানান। এই সম্মেলনে বৌদ্ধ ধর্ম ও সামাজিক কল্যাণে অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সনদপত্রসহ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির তথ্য ও প্রচার বিভাগ কর্তৃক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়, কল্যাণপুর রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত।

শুভেচ্ছা মূল্য ১০.০০ টাকা মাত্র।

JUMMA SAMBAD BULLETIN

News letter of the Parbatya Chattagram Jana Samhati Samiti (PCJSS)

Issue no. 31, 12th Year, March 2003

Published by Information and Publicity Department of PCJSS from its Central Office, Kalyanpur, Rangamati, Bangladesh. Phone: +880-351-61248 E-mail: pcjss@hotmail.com.

Price : TK. 10.00 only.